

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ড. সুরাইয়া পারভীন

মোস্তাফা জব্বার

মুনির হাসান

লুৎফুর রহমান

মোঃ মুনাবিবর হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবন সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। শিক্ষানীতিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। আশা করি, এ পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে স্বাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তুলবে, যা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১-১৬
দ্বিতীয়	কম্পিউটার সফটওয়্যার যন্ত্রপাতি	১৭-৩৬
তৃতীয়	নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার	৩৭-৫২
চতুর্থ	ওয়ার্ড প্রসেসিং	৫৩-৬০
পঞ্চম	শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার	৬১-৭২

প্রথম অধ্যায়

প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

১. ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করতে পারব;
৩. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
৪. সমাজ-জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ ১: ব্যক্তি জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পৃথিবীতে কত নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম হচ্ছে, আমরা হয়তো তার সবগুলোর কথা জানতেও পারি না। তাই সেগুলো হয়তো আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব কেলতে পারে না। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যেটি আমাদের সবার জীবনেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীতে মনে হয় একজন মানুষকেও বুঝে পাওয়া বাবে না, যে কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি কিংবা তার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোনো না কোনো পরিবর্তন আনে নি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু যে রাষ্ট্রীয় বড় বড় বিষয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবহৃত হয় তা নয়— একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনেও সেটি ব্যবহৃত হয়। ছুমি যদি চোখ মেলে চারদিকে তাকায় ছুমি দেখবে তোমার চারপাশে তোমার পরিচিত মানুষেরা, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার স্কুলের শিক্ষকরা, তোমার ক্লাসের কনুবাধকরা এবং ছুমি কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। এই যে ছুমি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছে সেটি কেউ একজন লিখেছে— তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো ছাপা হয়েছে, তোমার সামনে আনা হয়েছে এবং ছুমি এখন পড়তে পারছি। এরকম কত উদাহরণ দেয়া যাবে— ছুমি কল্পনাও করতে পারবে না।



আমাদের চারপাশের যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে।



টেলিভিশন এখন বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

একজন মানুষের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার হতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করলে সেটা মনে হয় কোনোসিন শেষ করা বাবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? অন্ততপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ করেকটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রথম

উদাহরণ হতে পারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আমাদের চারপাশের প্রায় সবার কাছেই এখন মোবাইল টেলিফোন রয়েছে, যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে

কোনো মানুষের সাথে টেলিকোন যোগাযোগ করতে পারার কারণে আমাদের জীবনের মান এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, অনেক কম পরিশ্রমে আমরা এখন অনেক কিছু করতে পারি যেটা আগে কল্পনাও করতে পারতাম না।

বিনোদন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি



জিপিএস পৃথিবীর যে কোনো জায়গার অবস্থান বের করে ফেলতে পারে।

দিয়ে আমরা যে শুধু কাজ করতে পারি তা নয়— এটা এখন বিনোদনেরও চমৎকার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে গান শোনার জন্যে মানুষকে আলাদাভাবে কোনো একটা যন্ত্র কিনতে হতো— এখন মোবাইল টেলিকোনেই সে গান শুনতে পারে। একটা সময় ক্যামেরা ছিল শুধু ধনীসেব ব্যবহারের বিষয়— এখন সাধারণ মোবাইল টেলিকোন দিয়েই যে কোনো মানুষ ছবি তুলতে পারে, ভিডিও করতে পারে। মোবাইল টেলিফোন ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়— টিক সেরকম কম্পিউটারও ছোট হতে শুরু করেছে। ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ, ল্যাপটপ থেকে নোটবুক, নোটবুক থেকে স্মার্ট ফোন অর্থাৎ আমাদের হাতে এমন একটা যন্ত্র চলে আসছে যেটা দিয়ে আমরা অসংখ্য কাজ করতে পারব।

জিপিএস: গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে আমাদের পথঘাট চিনতে হবে। কেউ যদি পথঘাট চিনতে না পারে তাহলে সে কেমন করে পড়বে পৌঁছবে। অর্থাৎ মজার ব্যাপার হল কোথাও যেতে হলে এখন কাউকে পথঘাট চিনতে হয় না। পৃথিবীটাকে ঘিরে অনেক উপগ্রহ ঘুরছে তারা পৃথিবীতে সংকেত পাঠায়, সেই সংকেতকে বিশ্লেষণ করে যে কোনো মানুষ বুঝে ফেলতে পারে সে কোথায় আছে! তার সাথে একটা জায়গার ম্যাপকে জুড়ে দিতে পারলেই একজন মানুষ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। আজকাল নতুন সব গাড়িতেই জিপিএস লাগিয়ে দেয়া হয়। কোথায় যেতে হবে সেটি জিপিএস—এ দুকিয়ে দিলে জিপিএস গাড়ির স্ক্রাইনকে সঠিক পথ বাতলে দিয়ে পড়বে পৌঁছে দিতে পারবে। ১২ মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামের এই মহাকাশ যানটি বৃহস্পতিবার কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫৭তম দেশ।

দলপত্ৰ কাজ

মনে কর তুমি ঠিক করো কোনো ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার না করে তোমার গিন কাটাতে। সারা দিনে কোন কাজগুলো তুমি করতে পারবে না তার একটা তালিকা কর।

 **মতামত শিখানাম :** ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, স্মার্ট ফোন, জিপিএস, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

পাঠ ২: ব্যক্তিগত জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করি না। এটির ব্যবহার কত ব্যাপক সেটা বোঝার জন্যে আমরা কল্পনিক একজন মানুষের একটা দিনের কথা চিন্তা করি— যার নাম তার নাম সাগর।

সাগরের ঘুম ভাঙলো এলার্মের শব্দে, সে তার মোবাইল টেলিফোনে জের ছয়টার এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই তার মনে পড়ল আজ ছুটির দিন, তাকে কাজে যেতে হবে না। সাথে সাথে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। এলার্মটা বন্ধ করার সময় লক্ষ্য করল সেখানে ডেস্ক কম্পিউটারে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজ তার কন্যার জন্মদিন, বিকেলে তার বাসায় জন্মদিনের উদ্দেশ্যে।



কম্পিউটার ব্যবহার করে গান শোনা যায়।



ই-বুক রিডার ব্যবহার করে বই পড়া যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করতে করতে সে টেলিভিশনে ভোরের খবরটা শুনতে নেয়। খানের বাম্পার ফলন হয়েছে শুনতে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। আবার বংশোদ্ভূত একটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা দেখা দিয়েছে বলে সাগরের খানিকটা দুশ্চিন্তাও হল।

নাস্তা করে সাগর তার ল্যাপটপটি নিয়ে বসে, প্রথমেই সে তার ই-মেইলগুলো দেখে, তার প্রবাসী ভাই তার পরিবারের একটা ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটা তারি সুন্দর— সাগরের মনে হল সেটা ঘরে টানিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। ভাই সে পিটটারে সেটা পিট করে নিল।

ই-মেইলে চিঠিপত্রের উত্তর দিয়ে সে তার প্রিয় কয়েকটা

গান বাজাতে শুরু করে দেয়। গান শুনতে শুনতে সে তার ই-বুক রিডারে একটা বই পড়তে শুরু করে। প্রিয় বই পড়তে পড়তে কীভাবে যে সময় কেটে গেল সাগর বুঝতেই পারল না।

যখন বইটা শেষ হয়েছে তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তার মনে হলো বাসায় খাবার নেই। বাজার করা হয়নি। সাগরের হঠাৎ মনে হল ইন্টারনেটে খাবারের অর্ডার দেয়া যায়— তারা বাসায় এসে খাবার পৌঁছে দেয়। সাগর তখনই ইন্টারনেটে তার প্রিয় খাবার শিকার অর্ডার দিয়ে দেয়।

কিছুকণের মাঝেই হাসি-খুশি এক ডব্বুণ ডার বাসায় পিঙ্কা নিয়ে আসে। সাগর বলল, “আমার বাসাটা খুঁজে পেতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে?” ডব্বুণটি বলল, “একটুও অনুবিধে হয়নি- আমি জিপিএসে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা আমাকে কোন পথে আসতে হবে বলে দিয়েছে!”



কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করা যায়।

সাগর খেতে খেতে আবার ডার কম্পিউটারে পৃথিবীর খবরাখবর নেয়। নিউট্রিনো (Neutrino) নিয়ে বিজ্ঞানের একটা চমকপ্রদ খবর বের হয়েছে। নিউট্রিনো কী- সাগর সেটা জানে না তাই সে উইকিপিডিয়াতে নিউট্রিনো সম্পর্কে চমককার একটা লেখা পড়ে নিল। শুধু তাই নয়, নতুন একটা সিনেমা খুব নাম করেছে- সিনেমাটা দেখলে মন্দ হয় না। সাগর তখনই সিনেমাটা ডাউনলোড করতে শুরু করে দেয়, রাতে সে সেটা দেখবে।

বিকেলে কব্বুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে যাবে-

তাকে কিছু একটা উপহার দেয়া দরকার। কব্বুটি বই পড়তে খুব ভালোবাসে তাই সাগর ইন্টারনেটে একটা বই অর্ডার দিয়ে দেয়, কব্বুর বাসায় বইটা পৌঁছে যাবে। সে নিজের জন্যেও একটা বই অর্ডার দিল। ব্যাংক যথেষ্ট টাকা আছে কি না জানা দরকার। সাগর তখন তার ব্যাংকে খোঁজ নিল, সেভিলে থেকে কিছু টাকা তার চেঞ্চ একাউন্টে নিয়ে আসে।

সঙ্গীত কাজ

এখানে উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর কী কী কাজ করা সম্ভব তার একটি তালিকা কর।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ডার মোবাইল বেজে উঠে- বাড়ি থেকে ডার মা ফোন করেছেন। সাগর জিজ্ঞেস করল, “মা ভালো আছ তোমরা?” মা কলেশন, “হ্যাঁ ভালোই আছি, তবে ডোর বাবার চশমাটা মনে হয় বদলাতে হবে, স্পর্ক নাকী দেখতে পায় না।” সাগর বলল, “জুমি চিন্তা করো না মা, আমি সামনের সপ্তাহে চলে আসব, বাবাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।”

মায়ের সাথে কথা শেষ করে সাগর মোবাইল টেলিফোনে তখনই ট্রেনের টিকেট বুক করে দেয়। ভালো চোখের ডাক্তারের খোঁজ নেবার জন্যে সে রাতে ই-চিকিৎসা কেন্দ্রে খোঁজ নেবে।

কব্বুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে সবাই মিলে খুব আনন্দ করল, ছোট বাচ্চারা ঘরের এক কোনার হইচই করে কম্পিউটার গেম খেলেছে। রাতে খাবার খেয়ে সাগর বাসায় ফিরে আসে। পরদিন কাছে যেতে হবে তাই সে সকাল সকাল শূয়ে পড়ে। বিজ্ঞানার শূয়ে শূয়ে সে শেষ খবরটা শূনে নেয়। উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে ঘূর্ণিঝড়টা ঘুরে অন্যদিকে চলে গেছে। দেশের কোনো বিপদ নেই। খবরটা শূনে সাগরের মনটা ভালো হয়ে যায়- নিশ্চিত মন নিয়ে সে ঘুমাতে গেল।

কাল্পনিক মানুষের কাল্পনিক সিনসিপি এখানেই শেষ- তোমরা কী লক্ষ করলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে সে সারাটা দিন কত কাজ করেছে? আর কিছুদিন আগেও কেউ কি এটা কল্পনা করতে পারতো?

 **নতুন শিখলাম:** ই-বুক রিডার, উইকিপিডিয়া, ডাউনলোড, ই-চিকিৎসা কেন্দ্র, নিউট্রিনো।

পাঠ ৩ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা সবাই জান শিক্ষার্থীরা স্কুল শেষ করে কলেজে যায়, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। আমাদের দেশে অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে শিক্ষার্থীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে আলাদা করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এক সময় এই ভর্তি পরীক্ষার কাজটি ছিল খুব কঠিন, শিক্ষার্থীদের অনেক দূর থেকে দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে, ট্রেনে, জাহাজে যেতে হতো, সাইনে সাঁড়িয়ে ভর্তির ফর্ম আনতে হতো। সেই কর্ম পূরণ করে আবার তাদের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো, ক্যাশ টাকা জমা দিতে হতো, কর্ম জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্র দিতে হতো, সেই প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ হলে ফলাফল প্রকাশিত হতো—খবরের কাগজে সেই ফলাফল দেখে যারা সুযোগ পেতো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।

২০০৯ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করল তারা পুরো প্রক্রিয়াটি তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে শেষ করবে— এবং এই ভর্তি প্রক্রিয়ার কোথাও কোনো কাগজ ব্যবহার হবে না। ভর্তির রেজিস্ট্রেশনের জন্যে কোনো প্রার্থীকে তার ঘর থেকেই বের হতে হবে না। কাগজবিহীন এই ভর্তি প্রক্রিয়াটি ২০০৯ সালের ২১ আগস্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন— এবং তারপর থেকে এই দেশের প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। সবাই নিজেদের ঘরে বসে শুধুমাত্র মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে বিশাল একটি কর্মক্ষেত্র হয়ে গেলো পানির মতো সহজ:

সঙ্গত কথা

তোমাদের স্কুলের অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে হলে কী কী কাজ করতে হবে গুছিয়ে লিখ।

প্রকল্প স্থাপনা হয়েছিল কিন্তু তখন সেটি ছিল অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের মতো, কারণ এটি বাস্তবে রূপ দিতে হলে অফিসের সবার কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে— যেটি তখন কেউ চিন্তাও করতে পারত না।



মোবাইল ফোনে এস এম এস পাঠিয়ে এখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম করার এই বিষয়টি আমাদের দেশে যাত্রা শুরু হলেও খল্লাপাটি কিছু নতুন নয়। ১৯৭৫ সালে বিজনেস উইক নামের একটা ম্যাগাজিনে প্রথমবার এটি সম্পর্কে একটি



বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদের তৈরি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করে দেশে আজকাল ভোট দেয়া আর ভোট গণনার কাজ শুরু হয়েছে।

এখন সেটি বাস্তবসম্মত হয়েছে। এখন অনেক অফিস পুরোনুরি কাগজবিহীন অফিসে পাণ্টে গেছে। অফিসে কাগজে কিছু লিখতে হয় না- কম্পিউটারে লিখে একজন আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্ক দিয়ে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে আছে কাজেই চোখের পলকে সব কাজকর্ম হয়ে যায়। কাগজে কিছু লেখা হয় না বলে কাগজের খরচ বেঁচে যায়। কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে তাই যখন কাগজ বেঁচে যায় তখন গাছও বেঁচে যায়, পরিবেশটা থাকে অনেক সুন্দর। কাগজে লেখার কালি টোনার ব্যবহার হয় না বলে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিবেশও দূষণ হয় না।

যত দিন যাচ্ছে কম্পিউটারের মনিটরগুলো হচ্ছে বড়, তাই সেখানে কিছু একটা পড়ার কাজটিও হয়েছে অনেক সহজ। দেখা গেছে নতুন প্রজন্মের মানুষেরা আজকাল কিছু একটা কাগজে না লিখে কম্পিউটারে লিখতে পছন্দ করে, কাগজে না পড়ে মনিটরে পড়াই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একসময় ক্যামেরার ছবি ফুলে সেগুলো প্রিন্ট করতে হতো। আজকাল ক্যামেরার তোলা ছবি প্রিন্ট না করেই মানুষ সরাসরি কম্পিউটারে বা মোবাইলের স্ক্রিনে দেখে নেয়।

আমাদের দেশে কাগজ ছাড়া সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজটি হচ্ছে ভোটার মেশিন। দেশটি গণতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশে সবকিছুই ঠিক করা হয় নির্বাচন করে। নির্বাচনে ভোট দিতে হয়। ভোট দেয়ার জন্যে সরকার ব্যালট পেপার- অর্থাৎ কাগজ, যেখানে প্রার্থীদের নাম এবং মার্কা ছাড়া থাকে। ভোটারদের সেখানে গিল মেয়ে ব্যালট বালে ফেলতে হয়। নির্বাচনের শেষে সেগুলো গুনতে হয়।

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে এরকম কোনো সমস্যা নেই- যারা ভোট দেবে তারা সরাসরি মেশিনের বোতাম চেপে ভোট দেয় এবং নির্বাচনের সময় শেষ হলে মুহূর্তের মধ্যে ফলাফল বের হয়ে যায়। তোমরা শুনলে খুব খুশি হবে আমাদের দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এই ইলেকট্রনিক মেশিন দিয়ে করা শুরু হয়ে গেছে।

দলপতি কাজ
তোমাদের রাসে দুটি দল তৈরি করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করলে কী সুবিধা এবং কী অসুবিধা সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।

নতুন শিক্ষাম: টোনার, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন।

পাঠ ৪: কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কাজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম চালানো যদি তথ্য প্রযুক্তির একটা খাপ হয় তাহলে তার পত্রের খাপটি কী হতে পারে?

তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই অনুমান করে বেলেছ— সেটি হবে অফিসে না গিয়েই অফিস করা। আমরা সবকিছুই যদি কম্পিউটার দিয়ে করি, আর সব কম্পিউটারই যদি নেটওয়ার্ক দিয়ে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে সেয়া থাকে তাহলে আমি সেই কম্পিউটারটা অফিসে বসে ব্যবহার করছি নাকি বাসায় বসে ব্যবহার করছি তাতে কী আসে যায়? আসলেই কিছু আসে যায় না— আর সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের অফিসের ধারণা। ১৯৮৩ সালে প্রথম এটা নিয়ে আলোচনা হয় আর ১৯৯৪ সালে প্রথম এ ধরনের একটা অফিস তার কাজ শুরু করে। যারা কাজ করছে তারা সশরীরে কেউ অফিসে নেই কিন্তু অফিসের কাজ চলছে— এরকম অফিসের নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল অফিস।



একটি বিশাল কম্পিউটার।

সব অফিসকেই যে ভার্চুয়াল অফিস বানানো যাবে তা নয়— কিন্তু যোগাযোগ বানানো যাবে— সেখানে অনেক লাভ। প্রথমত তোমাকে অফিসের জন্যে বড় ব্যয় করতে হবে না। রাস্তাঘাটের ট্রাফিক জ্যামের সাথে যুদ্ধ করে কাটকে অফিসে আসতে হবে না। বাসায় বসে কাজ করতে পারবে বলে অফিসের কাজের পাশাপাশি বাসায় কাজকর্মও করতে পারবে। অফিসে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে পারে— কিন্তু বাসায় বসে কাজ করলে অফিসের সময়ের বাইরেও অনেক কাজ করা সম্ভব। কাজেই ভার্চুয়াল অফিসের কাজকর্ম সাধারণ অফিস থেকেও বেশি হতে পারে।

ভার্চুয়াল অফিসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সুবিধের কথাটা এখনো বলা হয়নি। সাধারণ অফিসে যারা কাজ করে তাদেরকে অফিসের কাছাকাছি থাকতে হয়। ভার্চুয়াল অফিসে যেহেতু কার্ডকে সশরীরে থাকতে হয় না তাই তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে। কাজেই এক অফিসের একেকজন হয়তো একেক শহরে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী অনেক অফিসেই কিছু এভাবে কাজ করে। পৃথিবীটা যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘুরে তাই এক পৃষ্ঠে যখন দিন তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে রাত। দিনের বেলা হয়তো একদল অফিস করে ঘুমাতে পেল, তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠের অন্য দল ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিল! যার অর্ধ অফিসটা চব্বিশ ঘণ্টা চলছে।



অনেক তরুণ তরুণী আজকাল অফিসে গিয়ে মশিন খাটটা কাজ না করে - তার নিজের ঘরে বলে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছে কাজ করে।

আজকাল কম সেন্টার বলে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়- আমাদের দেশেও কম সেন্টার

বসানোর কাজ চলছে। নানা ধরনের কম সেন্টার থাকতে পারে- তারা নানা ধরনের কাজ করে- একটা সহজ উদাহরণ হতে পারে, সেটি কোনো একটা কোম্পানির কাছে যারা নানা কিছু জানতে ফোন করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া। ধরা যাক কেউ একটা কম্পিউটার কিনেছে- সেই কম্পিউটারটা নিয়ে তার একটা সমস্যা হয়েছে তাই সে কম্পিউটারের কোম্পানীতে ফোন করল। সে হয়তো ভাবছে তার ফোনের উত্তর দিচ্ছে আশপাশের কোনো একজন মানুষ- আসলে সেই ফোনটি হয়তো চলে এলেহে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কোনো একটি কম সেন্টারে। সেখানে যারা আছে তারা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব ভালো করে জানে কারণ তাদের কাছে আসে হয়তো আরো অনেক মানুষ এই প্রশ্নটি করেছে। তাই খুব সহজেই কম সেন্টার থেকে উত্তর দিয়ে সেই মানুষটিকে খুশি করে দিল।

দলান্ত কাজ

তোমাদের স্কুলে একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করতে হলে কী কী করতে হবে সেটি লিখ।

আমাদের দেশের অনেক তরুণ-তরুণী আজকাল অফিসে গিয়ে নির্ধারিত সময়ে কাজ করার চেয়ে তার নিজের ঘরে বসে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছে কাজ

করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাদের কাজের ক্ষেত্রটি তখন আর নিজের শহর কিংবা নিজের দেশের মাঝে আটকে থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় সারা পৃথিবী। তারা শুধু যে কাজ করে আনন্দ পায় তা নয়- অনেক টাকাও উপার্জন করতে পারে। এত কিছুর জন্যে তার সরকার শুধু একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের সংযোগ। অবশ্যই তার সাথে আরো একটা জিনিস সরকার- সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংর দক্ষতা।

কাজেই তোমরা বুঝতেই পারছ নতুন পৃথিবীতে একসাথে মিলে অনেকে কাজ করতে হলে তাদেরকে আর এক ছারপার বসে কাজ করতে হয় না। এই যে বইটা ছুঁই পড়ছ- ছুঁই কি জান যারা এই বইটা লিখেছে, সাক্ষিরেছে তারা কেউ কোনো একসাথে বসে নি- সবাই নিজের ঘরে বসে কাজ করেছে।

 **নতুন শিক্ষাম:** ভার্চুয়াল অফিস, কম সেন্টার, কাগজবিহীন অফিস।

পাঠ ৫ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা নিচয়ই জান বাংলাদেশ এখন বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি করে পৃথিবীর বড় বড় দেশে রপ্তানি করে। আমাদের এক সুন্দর দেশটির জেতর দিয়ে বিশাল বিশাল নদী গিয়েছে— এই দেশের মানুষ নদী বিল সমুদ্রে বড় হয়েছে— কাজেই তারা যে চমৎকার নৌকা আর জাহাজ বানাতে পারবে তাতে অবাক হবার কী আছে?



ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট দিয়ে আজকাল বিপজ্জনক যান্ত্রিক কাজ করা হয়।

তোমরা শূনে খুশি হবে— এখননের বিপজ্জনক কাজগুলো আসলেই আস্তে আস্তে মানুষ নিজে না করে রোবটদের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে। মানুষেরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়— একঘেয়ে কাজ হলে কাজ করতে ইচ্ছেও করে না। রোবটরা ক্লান্ত হয় না। একঘেয়ে কাজটি নিয়ে তারা কখনো অভিযোগও করে না। তাই পৃথিবীর বড় বড় ফলকামখানার প্রমিক হিসেবে আর মানুষ নেই। কাজ করে রোবটরা। মানুষেরা বড় জোর সাথে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না।

একঘেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলো মানুষ থেকে রোবটেরা অনেক ভালোভাবে করতে পারে। কাজেই যত দিন যাচ্ছে ততই এই কাজগুলো মানুষের বদলে মেশিনেরা করছে— তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

বড় বড় জাহাজ বানাতে হলে বিশাল বিশাল ধাতব টুকরোকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে তারপর গুয়েল্ডিং করতে হয়। তোমরা নিচয়ই পথেঘাটে দোকানে গুয়েল্ডিং করতে দেখেছ। সেখান থেকে যে তীব্র আলো বের হয় কেউ যদি সোজাসুজি সেদিকে তাকায় তাহলে তার চোখ পাকাপাকিতাবে কড়িহস্ত হয়ে বাবে। যারা গুয়েল্ডিং করে তাদের বিশেষ চশমা পরে কাজ করতে হয়। সেখানে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, ধাতব টুকরো ছিটকে ছিটকে পড়ে। কাজটি দেখেই মনে হয় এটি বেশ বিপজ্জনক কাজ। এই বিপজ্জনক কাজটি যদি মানুষকে করতে না হতো, কোনো একটা রোবট করতো— তাহলে কেমন হতো?



দ্রুইতর হাড়ই এই পড়ী চালানো যায়।

আমাদের পথে ঘাটে প্রতিদিন কত একসিডেন্ট হয়- মোটামুটি অনুমান করা যায় আর কয়েক দশক পর একসিডেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে- কারণ তখন গাড়ি আর মানুষেরা চালাবে না। গাড়ি চালাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যন্ত্র। গাড়ির বেলায় সেটা শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে- আকাশ পথে সেটা কিন্তু এর মাঝে শুরু হয়ে গেছে। বিশাল বিশাল প্লেন যখন আকাশে উড়ে তখন পাইলটদের কিছু করতে হয় না- কম্পিউটারই সবকিছু করে। যুদ্ধবিমান যেগুলো আছে সেখানে আজকাল পাইলট থাকেই না, পাইলটবিহীন ড্রোনরা যে প্রতিদিন যুদ্ধ করছে বোমা ফেলছে সেটা তো খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়।

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি কেমন করে ব্যবহার হয় তার তালিকা করতে গেলে সেটি শেষ হবে বলে মনে হয় না। দাপ্তরিক চিঠিপত্র যোগাযোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে-অফিসের মিটিংগুলোও আজকাল অন্যভাবে হয়। বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন মানুষ আলাদাভাবে বসে একসাথে কনফারেন্স করে ফেলে! আমাদের দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-ক্লাসরুম তৈরি হচ্ছে, একজন শিক্ষক তার



কোনো পাইলট ছাড়াই এই প্লেনটি আকাশে উড়ে।

ক্লাসরুমে পড়াবেন, সারা দেশের অসংখ্য মানুষ তার কাছে পড়বে। অফিসের ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আগে অফিসে বড় বড় ফাইল এক ঘর থেকে অন্য অফিসে যেতে দিন পার হয়ে যেতো- নতুন ইলেকট্রনিক ফাইল চোখের পলকে এক অফিস থেকে অন্য ঘরে চলে যেতে পারে।


দলগত কাজ

রোবট দিয়ে করাতে চাও এমন কতগুলো কাজের তালিকা তৈরি কর।

অফিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হয় টাকা পয়সা বা একাউন্টিং সংক্রান্ত, তথ্য প্রযুক্তির কারণে সেই কাজগুলো এখন আর মানুষকে করতে হয় না-

বড় বড় লেজার খাতায় মাথা গুঁজে কিছু লিখতে হয় না, কম্পিউটার মুহূর্তে সবকিছু করে ফেলে।

মানুষের কাজের জায়গায় সবসময়েই কাউকে না কাউকে কিছু একটা বলতে হয়, বোঝাতে হয়, সেমিনার দিতে হয়। এসব কাজের জন্যে এত চমৎকার ব্যবস্থা বের হয়েছে, এত সুন্দর করে সবকিছু করে ফেলা যায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় আগে এই কাজগুলো কেমন করে করা হতো?

 **নতুন শিখলাম:** রোবট, পাইলটবিহীন ড্রোন, ই-ক্লাসরুম

পাঠ ৬: সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে আইসিটি : আমরা সবাই সমাজে থাকি। ভূমি, তোমার বন্ধুরা হয়তো কেনো গ্রাম বা শহরে থাকে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো স্কুলের হোস্টেলে থাকে। বাবা, মা, দাদা, দাদী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বাকি সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এখানে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা বাসায় থাকে। সবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজের নানা প্রয়োজনে আমরা নানান ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করি। একসময় যোগাযোগ বলতে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে হতো খবর দিতে। পরে দেখা গেলো টেলি বাক্সিয়েও খবর দেয়া যায়। মানুষ বখন লিখতে শিখল তখন সে চিঠি লিখে মনের ভাব আর খবর পাঠাতে শুরু করল। গড়ে উঠল ডাক বিভাগ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের আবিষ্কার এই ব্যাপারগুলোকে আরও সহজ করে ফেললো।

আর এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সামাজিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোর। আইসিটির প্রচলিত হাতিয়ারগুলোর পাশাপাশি এখন ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের অনেক জনপ্রিয় ডয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যা এই সামাজিক কর্মকান্ড সহজভাবে করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আইসিটি ব্যবহার করে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো বিকশিত হচ্ছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রথমে দেখে নেই :

ক. অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ: একসময় কেবল কালজের আমন্ত্রণপত্র এবং টেলিফোনেই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দেওয়া যেত। এখন এগুলোর পাশাপাশি ই-মেইল বা যুটোফোনের খুদেবার্তার (এসএমএস) দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল বা খুদেবার্তার সুবিধা হলো তা যার কাছে পাঠানো হচ্ছে ঠিক সে সময়েই তাকে ফোন ব্যবহার করতে হয় না, তার সুবিধামত সময়ে সে দেখে নিতে পারে।

খ. বিশেষ দিবসসমূহে শুভেচ্ছা বার্তা: ভূমি তোমার বন্ধুদের জন্মদিন, ঈদ বা পূজার সময় শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠাতে চাও। ফেসব বন্ধু তোমার আশেপাশে থাকে তাদের কাছে ভূমি তোমার হাতে বানানো কার্ড দিতে পারো। কিন্তু বান্না তিন্ন দেশে বা তিন্ন দুরত্বে থাকে? তাদের কাছেও কার্ড পাঠানো যার ডাকযোগে ভবে এখন সবাই পাঠায় ই-কার্ড। ই-কার্ড দুইভাবে পাঠানো যায়। একটি হলো ভূমি নিজে কম্পিউটারে



ই-কার্ড অনেক চমকপ্রদ হতে পারে, কার্ডজ কার্ডি ব্যবহার হয় না বলে অনেক পরিবেশ বান্ধব।

ই-কার্ড তৈরি করে সেটি ই-মেইলে পাঠাতে পারো। আবার ইন্টারনেটে অনেক ই-কার্ডের সাইট আছে যেখান থেকে ছুমি তোমার পছন্দের ই-কার্ডটি তোমার প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো। এখন্য সাধারণত কোনো টাকা-পয়সা খরচ হয় না। তোমার বন্ধু বা প্রিয়জন তাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার কার্ড পেয়ে যান। আবার শুভেচ্ছা জানানোতেও মুর্তোক্ষেপনের খুসেবার্তা এখন অনেক জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে খুব সহজে প্রিয়জনের কাছে শুভেচ্ছা, উদ্বেগ বা উৎসর্কা পৌঁছে দেওয়া যায়। এখন আবার বিভিন্ন এফএম রেডিওতে পছন্দের গান বাজিয়েও প্রিয় বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওরাজ চালু হয়েছে। এসএমএস এর মাধ্যমে প্রবণ প্রতিবন্ধীরাও ভাববিনিময় করতে পারে। একইভাবে কথাবলা সফটওয়্যার (Talking) এর মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন



ছবি সজ্জকন আর বিতরণের জন্যে চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে।

ব্যবহার করতে পারে। এসবের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনগুলো দৃঢ় হয়।




ইউ টিউবে একটি ভিডিও।

এখনের ডিজিটাল ছবি ইচ্ছে করলেই প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। ইন্টারনেটে এখন বিভিন্ন সাইট রয়েছে যেখানে ছুমি ছবি আপলোড করে ডা অন্যদের জানাতে পারবে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে পুগলের পিকাসা (picasa.google.com) এবং ইয়াহু!র ফ্লিকার এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কেবল ছবি নয়, ইচ্ছে করলে ছুমি তোমার তোলা ভিডিও সারা বিশ্বের সামনে ছুঁতে পারো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের মাধ্যমে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে ইউটিউব (www.youtube.com) অধিক জনপ্রিয়।

দলপত কাজ

তোমাদের ক্লাসের কোনো একটি অনুষ্ঠানের জন্যে এসএমএস ব্যবহার করে অভিযিনের আমন্ত্রণ জানাও।

 **নতুন শিকলাম :** খুসে বার্তা, ই-কার্ড, ভিডিও শেয়ারিং সাইট।

পাঠ ৭: সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক যোগাযোগের সাইট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক যোগাযোগকে দ্রুত, আকর্ষণীয়, এবং কার্যকরী করে তুলেছে। শুধু এ নয়, এর বাইরেও দানাদরভাবে আমাদের সামাজিক ব্যাপারগুলো ইন্টারনেটে উঠে এসেছে। আগের পাঠে বলা হয়েছে তোমার কম্পিউটারে কোনো কিছু জানাতে হলে খুসেবার্তা বা ই-মেইল পাঠানোর কাজটি কিন্তু তোমাকে করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তুমি বা কিছু কম্পিউটারে তোমার কম্পিউটারে জেনে যাচ্ছে, আলাদা করে তোমার কিছুই করতে হচ্ছে না তাহলে



কেমন হয়? নিচয়ই খুবই ভালো হয়। এই চিন্তা থেকে এখন ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে বেশকিছু সামাজিক যোগাযোগের সম্পূর্ণ সাইট। নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, অনুষ্ঠানাদি, চাকরিতে প্রমোশন, সন্তানাদির বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিও বিনিময় করা বায় এগুলোর যে কোনো একটি থেকে। বর্তমানে প্রায় শতাধিক এরকম ওয়েবসাইট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফেসবুক (www.facebook.com), লিংকড-ইন (Linked-in.com) টুইটার (www.twitter.com), জোপ্পা (www.zooppa.com), মাইস্পেস (www.myspace.com) এগুলো খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাভাষী লোক এই সাইটগুলো ব্যবহার করে।

পৃথিবীর কোটিকোটিক লোক ফেসবুক ব্যবহার করে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক। পৃথিবীর কোটিকোটিক লোক এখন ফেসবুকের ব্যবহারকারী। বাংলাদেশেও ফেসবুকের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। ফেসবুক বা অনুরূপ সাইটগুলোতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার পরিচিতিমূলক একটি বিশেষায়িত ওয়েবপেইজ চালু করতে পারেন। এটিকে বলা হয় ব্যবহারকারীর প্রোফাইল। ব্যবহারকারী তার নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, তার ভালোলাগা মন্দলাগা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার প্রোফাইলে প্রকাশ করে। এরপর একজন তার প্রোফাইল থেকে ফেসবুকে তার 'কম্পিউটারে খুঁজে বের করে। এখানে কম্পিউটারে আমরা প্রচলিতভাবে যেটা বোঝাই সেটা বোঝানো হচ্ছে না, ফেসবুক অনুযায়ী একজন মানুষের সঙ্গে অন্য যত মানুষের যোগাযোগ থাকবে তারা সবাই হচ্ছে তার 'কম্পিউটারে'। যদি তোমার কম্পিউটারে ফেসবুকে প্রোফাইল থাকে তাহলে তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে কম্পিউটারে জন্ম অনুক্রম পাঠাতে পারো। যদি সে সম্মতি দেয় তাহলে তোমরা কম্পিউটারে হলে যাবে। একইভাবে অন্য কেউ যদি তোমাকে কম্পিউটারে জন্ম অনুক্রম করে তার তা তুমি গ্রহণ করো তাহলে তুমিও তার কম্পিউটারে হলে। তুমি তার তোমার কম্পিউটারে মিলে হবে তোমার 'নেটওয়ার্ক' বা তোমার 'সামাজিক নেটওয়ার্ক'।

এখন তোমার নেটওয়ার্ক আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে। তোমার প্রাইমারি স্কুলের যে কন্সট্রিক্টর সাথে তোমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না, যে কিনা এখন হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, তাকেও তুমি এখানে খুঁজে পেতে পারো। তুমি যখনই তোমার প্রোফাইলে কোনো তথ্য প্রকাশ করবে সফল সফল তা তোমার কন্সট্রিক্টর পেজের একটি বিশেষ জায়গায় ভেসে উঠবে। তুমি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে যা ফেসবুকে 'স্ট্যাটাস' নামে পরিচিত। টুইটারে এটাকে বলা হয় টুইট!



টুইটার দিয়ে সরাসরি বিনিময় এখন খুবই প্রচলিত একটি পদ্ধতি।

তুমি যদি কোনো ছবি প্রকাশ করো, যদি কোনো ভিডিও সবাইকে দেখাতে চাও তাহলে তা তোমার প্রোফাইলে প্রকাশ করলেই তা তোমার নেটওয়ার্কের সবাই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, তোমার কন্সট্রিক্টর সবাইকে ফেসবুক মনে করিয়ে দেবে তোমার জন্মদিন কবে! সবাই তখন তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবে। কেবল তোমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নয়। এখন এই সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর মাধ্যমে




সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল।

পণের বিজ্ঞাপন, কাজের খবর এমন কি সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজও হচ্ছে। ২০১০-২০১১ সালে আরব বিশ্বে, বিশেষ করে তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়ার যে সামাজিক বিপ্লব হয়েছে তার পেছনে এই সকল সামাজিক যোগাযোগের সাইটের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়।

দলগত কাজ

ফেসবুকের মতো একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সতুন কী করা যায় সেটি শিখ।

 **নতুন শিকলাম:** প্রোফাইল, সামাজিক নেটওয়ার্ক, স্ট্যাটাস।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন আবিষ্কারের ফলে নতুন কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথঘাট চিনতে সুবিধা হয়?

- ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট
গ. মোবাইল ফোন ঘ. জিপিএস

২. নিউট্রিনো সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে আমরা কোনটি ব্যবহার করব?

- ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট
গ. ল্যান্ডফোন ঘ. মোবাইল ফোন

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে –

- i. বই পড়া যায়
ii. ব্যাংকের লেনদেন করা যায়
iii. গেম খেলা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেবা এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে এক রাতে বসেই সে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে।

৪. রেবা ভর্তির আবেদন করতে পারে –

- i. মোবাইল ফোন ব্যবহার করে
ii. ইন্টারনেট ব্যবহার করে
iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. এ ধরনের আবেদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুবিধাদি হল—

- i. সময় ও অর্থ সাশয়
ii. শারীরিক শ্রম লাঘব
iii. পরিবেশ সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. রেবা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভর্তির আবেদন করেছিল তার নাম কী?

- ক. মোবাইল প্রযুক্তি খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ. ইন্টারনেট ঘ. কম্পিউটার

৭. ৬ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

.....

দ্বিতীয় অধ্যায়

কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

১. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব,
২. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পারস্পরিক সংসর্গ ব্যাখ্যা করতে পারব,
৩. কম্পিউটারের চিত্র একে এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ৮: ইনপুট ডিভাইস

যষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা আইসিটি'র বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছ। এ পাঠে আইসিটি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

সময়ের সাথে এ যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমেই আরও আধুনিক হয়ে উঠছে। বিষয়টা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজকের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রটিই আগামীকাল পুরানো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার তো আছেই। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটির কথাই ধরো – আগামীতে এমন টেলিভিশন পাওয়া যাবে যেটা মুখের কথাতাই চন্দবে। শূন্যে অবাক হলে! কথা বলেই এখন ইনপুট দেওয়া সম্ভব। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটি হয়তো এতে অচল হয়ে পড়বে। প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তোমরা যারা এখন সস্তম শ্রেণিতে পড়ছো তারা একটু উপরের শ্রেণিতে যেতে যেতেই এই যন্ত্রপাতির অনেকগুলোই যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হবে। তবুও বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ যন্ত্রপাতি পাণ্টে গেলেও ইনপুট, স্টোরাজ, প্রসেসিং এবং আউটপুটের ধারণাটা কিছু পাণ্টে যাচ্ছে না।

কী বোর্ড (Keyboard): কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার প্রধান (বহুল ব্যবহৃত) যন্ত্র হলো কী বোর্ড। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকাংশ যন্ত্রে সাধারণত কী বোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয়। এ সকল যন্ত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাইলে যন্ত্রগুলোকে কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। আমরা যখন কী বোর্ডের বোতাম চলে যন্ত্রগুলোকে এ নির্দেশনালগুলো দেই। তখন যন্ত্রগুলো আমাদের চাওয়া অনুযায়ী কাজটি করে দেয়।

আজকের দিনের আধুনিক কম্পিউটার কী বোর্ডের ধারণা এসেছে টাইপরাইটার নামের এক ধরনের যন্ত্র থেকে। সাধারণত কী বোর্ডে বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ কিছু চিহ্ন সারিবদ্ধভাবে ক্রিয়াক্রম থাকে। কম্পিউটারের কী বোর্ড টাইপ রাইটারের কী বোর্ডের মতো হলেও বিশেষ কাজের জন্য কিছু অতিরিক্ত কী থাকে। কী বোর্ড সাধারণত ইথেরনেট ডাবল হলেও অন্যান্য ডাবল কী বোর্ডও পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সকল মোবাইল ফোনের কী বোর্ডে বাংলা লেআউট ফুড করার এক নির্দেশনা জারি করেছে।



কম্পিউটারের কী বোর্ড

মাউস (Mouse): তোমরা এর মধ্যে নিচেরই মাউস নামের একটি বস্তু ব্যবহার করে কেলোছো। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। একে অনেক পরয়েন্টিং ডিভাইসও বলে থাকে। যারা প্রথম এটি তৈরি করেছে তাদের খ্যাতি ছিল এটি দেখতে ইঁদুরের মতো, তাই এর নাম দেয়া হয়েছে মাউস।



মাউস

মাউসে সাধারণত দুটি বাটন ও একটি স্কল চক্র (রুলিং) থাকে। কম্পিউটারে ইনপুট দিতে এ বাটনগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধরনের মাউস প্রচলিত আছে। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ স্ট্যান্ডার্ড মাউস ব্যবহার করে।

কম্পিউটারের মনিটরের পর্দায় মাউসের অবস্থান দেখানো হয় কীন্ডের ফলাফল মতো একটি পরয়েন্টারের মাধ্যমে। মাউসটি নড়াচড়া করা হলে পরয়েন্টারটি অবস্থান পরিবর্তন করে। মাউসের বাটন ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। ডিজিটাল জপারেটিং সিস্টেমে মাউসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সাধারণ নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের চিহ্নের (আইকনের) উপর মাউসের বামদিকের বাটন একবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি নির্বাচিত (সিলেক্ট) হয় এবং পরপর দুই দুবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। ল্যাপটপ কম্পিউটারের টাচপ্যাড দিয়ে মাউসের কাজ সম্পাদন করা যায়।



মাইক্রোফোন


মাইক্রোফোন (Microphone):

এটিও একটি ইনপুট বস্তু। আমাদের কথা, গান বা যে কোনো ধরনের শব্দ এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক বোলাবোলে কথা বলার ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় বলে এ বস্তুর আবিষ্কার বেশ আগেরই হয়েছে। তবে এখন এটাকে নিরমিতভাবে

কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কথা বলা ছাড়াও স্তরেন্স রিকর্ডনিশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্রষ্টব্য কাজ

১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস বেগুলোর কী-বোর্ড আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন কর।
২. প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা থেকে একটি অভিন্ন তালিকা তৈরি কর।

 **নতুন শিক্ষায়:** স্কল চক্র (রুলিং), আইকন, স্তরেন্স রিকর্ডনিশন, মাইক্রোফোন।

পাঠ ৯: ইনপুট ডিভাইস

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera): আমাদের খুবই পরিচিত একটি যন্ত্র হচ্ছে ক্যামেরা। এসময়ে খুব জনপ্রিয় হলো ডিজিটাল ক্যামেরা। ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে গবেষণার কাজে বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণায় ডিজিটাল ক্যামেরা কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় সকল প্রকার ডিজিটাল ক্যামেরাই কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরাটিকে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে ডিজিটাল ছবি কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।



ডিজিটাল ক্যামেরা



ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা

ওয়েব ক্যাম (Web Cam): ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরারই একটি বিশেষ রূপ। এটি হার্ডওয়্যার হিসেবে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণত ল্যাপটপ কম্পিউটারে ওয়েব ক্যামেরা সংযুক্ত থাকে। ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে স্থির চিত্র বা ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করানো যায়। ওয়েব ক্যামেরা ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি ছবি বা ভিডিও আদান প্রদান করতে পারে। সামাজিক ওয়েব সাইটগুলোতে পারস্পরিক আলাপচারিতায় ওয়েব ক্যাম ব্যবহৃত হয়। ভিডিও কনফারেন্স বা ভিডিও ফোনে ওয়েব ক্যামের ব্যবহার সর্বাধিক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে এ ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয়েছে ওয়েব ক্যাম।

ওয়েব ক্যাম বর্তমানে নিরাপত্তা সন্ত্রাস বিধি কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়িতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এ ক্যামেরার সাথে সরাসরি কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। ফলে এ ক্যামেরা সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে প্রেরণ করে এবং তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরবর্তীতে সে ভিডিওচিত্র দেখে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশেও অপরাধ দমনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্ক্যানার (Scanner): একসময় ফটোকপি মেশিনের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি (কপি) করতাম। কিন্তু এ প্রতিলিপি যতবার দরকার ততবারই মেশিন ব্যবহার করতে হতো। তথ্যটি সংরক্ষিত থাকত না। এ সমস্যাটির সমাধান যে যন্ত্রটি করে দিয়েছে তার নাম স্ক্যানার। যে কোনো প্রকার ছবি, মুদ্রিত বা হাতে লেখা কোনো ডকুমেন্ট অথবা কোনো বস্তুটির ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি করার যন্ত্রের নাম স্ক্যানার। এ ডিজিটাল প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রকল্পের তথ্য কাঁইল আকারে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।



স্ক্যানার

ওএমআর (OMR): ওএমআর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার



ওএমআর বা অপটিক্যাল মার্ক রিডার

রিডার (Optical Mark Reader) এটিও একটি ইনপুট ডিভাইস। আলোর প্রতিক্রমণ বিচার করে এটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য বুঝতে পারে। ওএমআরের কাজের ধরন অনেকটা স্ক্যানারের মতো। বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু দাগ বা চিহ্ন ওএমআর পড়তে পারে।

বর্তমানে এটি অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। বিশেষ করে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরপত্র বাচাইয়ে এটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সঠিক উত্তরের বৃত্তটির অবস্থান কম্পিউটারকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা সঠিক বৃত্ত ভরাট করলে নম্বর পেয়ে যায়। অন্যথায় নম্বর পাওয়া যায় না। সঠিকটিসহ একের অধিক বৃত্ত ভরাট করলেও নম্বর পাওয়া যায় না। এর মাধ্যমে কম সময়ে অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়। এছাড়া মূল্যায়নে তুল বা পক্ষপাতিত্ব হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মনগত কাজ

- এখানে উল্লেখ করা হলো এমন কতগুলো ডিভাইস বেগুলোর ক্যামেরা আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন কর।



নতুন শিখলাম: ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েব ক্যাম, ভিডিও কনফারেন্স, স্ক্যানার, ডিজিটাল প্রতিলিপি, OMR।

পাঠ ১০: মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

যষ্ঠ শ্রেণিতে মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। এখন এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব। আজকাল কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ছাড়াও প্রায় সকল প্রকার প্রযুক্তি পণ্যেই মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সকল পণ্যই মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা পরিচালিত হয়। এ মাইক্রোপ্রসেসরকে চালনা করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। এ নির্দেশনাগুলো জমা রাখার জন্য মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন, গেম কনসোল বা এ ধরনের যাবতীয় যন্ত্রপাতির কাজ করার ক্ষেত্রে মেমোরি (Memory) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেমোরি দুই প্রকার। প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি এবং সহায়ক বা সেকেন্ডারি মেমোরি। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ যখন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বা সফটওয়্যার প্রধান মেমোরিতে অবস্থান করে। প্রধান মেমোরির গতি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি সিপিইউর সাথে ভাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়।

সাধারণত প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি দুই ধরনের—একটি হচ্ছে র‍্যাম RAM (Random Access Memory) এবং অন্যটি রম ROM (Read Only Memory)

৮ বিট = ১ বাইট

১০২৪ বাইট = ১ কিলোবাইট

(১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ মেগাবাইট

(১০২৪×১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ গিগাবাইট

(১০২৪×১০২৪×১০২৪×১০২৪) বাইট = ১ টেরাবাইট

প্রধান বা সহায়ক মেমোরির ক্ষমতা দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি হচ্ছে গতি বা হার্টজ (Hz) এবং অন্যটি হলো ধারণ ক্ষমতা বা বাইট (Byte) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক বাইট সমান ৮ বিট, ১০২৪ বাইট যেহেতু

১০০০ এর খুব কাছাকাছি সেজন্যে একে এক কিলোবাইট বলা হয়।

র‍্যাম (RAM): আইসিটি পণ্য তথা কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের মাদারবোর্ডের সাথে র‍্যাম সংযুক্ত থাকে।

প্রসেসর প্রাথমিকভাবে র‍্যামে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করে। প্রসেসর র‍্যাম থেকে তথ্য নিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। প্রসেসর র‍্যামের যে কোনো জায়গা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে বলে একে Random Access Memory বা সংক্ষেপে RAM বলা হয়। এখনকার দিনে প্রসেসরের ক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি সফটওয়্যারগুলো অনেক কার্যকর এবং জটিল হয়েছে তাই এগুলোকে মেমোরির অনেক বড় অংশ ব্যবহার করতে হয়। সেজন্যে এখনকার



নানা ধরনের র‍্যাম

কম্পিউটারগুলোর জন্য কমপক্ষে ২ গিগাবাইট বা তার চেয়ে বেশি মেমোরি দরকার হয়। প্রসেসরের গতির সাথে পাছা দিয়ে র‍্যামের গতিও এখন অনেক।

এখানে একটি বিষয় তোমাদের জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন— র‍্যামে—তথ্য থাকা না থাকা বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলে এর সমস্ত তথ্য মুছে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার চালু করলেই র‍্যাম প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। আবার কম্পিউটার বন্ধ করলে র‍্যাম তথ্য—শূণ্য হয়ে যায়।

র‍্যাম (ROM) : ROM বা Read Only Memory মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। আইসিটি যন্ত্রপাতি বা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সচল রাখার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। এ নির্দেশনাগুলো ছাড়া কম্পিউটার চালু করা যায় না। তাই র‍্যাম এ নির্দেশনাগুলো স্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে। বিদ্যুৎ থাকা না



র‍্যাম

থাকার উপর এই মেমোরি নির্ভর করে না। ব্যবহারকারীও বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এটি মুছে ফেলতে পারে না। এ মেমোরি শুধু পাঠ করা যায় বলে একে ROM বা Read Only Memory বলে। যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এর তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা যায় না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বলে।

দলগত কাজ

র‍্যাম ও র‍্যাম নামে দুটো দল গঠন করে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিতর্ক কর।

 **নতুন শিখায়ে:** মাইক্রোপ্রসেসর, বিট, বাইট।

পাঠ ১১: মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস

হার্ডডিস্ক (Hard Disk): তোমরা বারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা নিশ্চয়ই হার্ডডিস্কের কথাও জেনে গেছে। কম্পিউটারে খোলা ফাইল হার্ডডিস্কে জমা করে রাখা হয়। এটি আসলে তথ্য সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র। IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম হার্ডডিস্কের ব্যবহার করে। আইসিটি যন্ত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা। আজকের কম্পিউটারগুলোতে সাধারণত ৫০০ গিগাবাইট থেকে ৪ টেরাবাইট তথ্য ধারণক্ষমতার হার্ডডিস্ক লাগানো থাকে। এমনকি সাধারণ মোবাইল ফোনের তথ্য ধারণ ক্ষমতাও গিগাবাইটে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে ১৯৮০ সালে ১ গিগাবাইট তথ্য ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডডিস্কের আকার ছিল একটি বড়সর রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের সমান। আর এর দামও ছিল অনেক। প্রতি মেগাবাইটের জন্য পনেরো হাজার ডলার বা বারো লাখ টাকা খরচ করতে হতো। মনে হচ্ছে গালগল্প। কিন্তু এটাই বাস্তব! এখনকার হার্ডডিস্কগুলো প্রায় হাতের মুঠোর এটে যায়।



হার্ডডিস্ক

সাধারণত হার্ডডিস্কে কতগুলো চাকতি থাকে তাদের প্রটার বলা হয়। প্রটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয় বা কাচ বা সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি হয়। এই চুম্বকীয় পদার্থের উপরই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। হার্ডডিস্ক চালু হলে এই প্রটারগুলো ঘুরতে থাকে। সূর্যায়মান চাকতিগুলোর সংস্পর্শে হার্ডডিস্কের লেখা/পড়া (Write/Read) হেডটি এলে সে প্রটারে তথ্য সংরক্ষণ অথবা তথ্য পড়ে আমাদের প্রদর্শন করে।

তথ্য ধারণক্ষমতার কারণে হার্ডডিস্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি কম্পিউটারের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। অন্যটি আলাদাভাবে থাকে। একে এক্সটারন্যাল হার্ডডিস্ক বলে। এটি USB পোর্টের মাধ্যমে যেকোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে সংযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য এক স্থান থেকে অন্যত্র নিতে এখন আর সম্পূর্ণ কম্পিউটারটি না নিয়ে শুধু এক্সটারন্যাল হার্ডডিস্কটি নিয়ে গেলেই হয়।

সিডি/ডিভিডি (CD/DVD): সিডি বা ডিভিডি তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সবাই এগুলো দেখেছে। এর সাহায্যে কীভাবে রাখুন দেখা যায় তা তোমরা যষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছ। সিডি বা ডিভিডির নিচের দিকে একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থাকে যা দু-পাশে পলিকার্বনেট প্রাস্টিক দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। সিডি বা ডিভিডিতে তথ্য রাখা বা পাঠ করতে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। সিডি বা ডিভিডি ড্রাইভের হেড আসলে লেজার বিম তৈরি করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এ লেজার বিম অ্যালুমিনিয়ামের পাতে তথ্য সংরক্ষণ করে। পরে আবার যখন তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তখন সে তথ্য লেজার বিম পড়তে

পারে। সিডি বা ডিভিডি বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়। এগুলোর জনপ্রিয়তার কারণ : (১) তথ্য ধারণ ক্ষমতা অনেক (২) সহজে বহন করা যায় (৩) স্থায়িত্ব বেশি (৪) তুলনামূলক মূল্য অনেক কম (৫) ব্যবহার অত্যন্ত সহজ। তথ্য ধারণক্ষমতার দিক দিয়ে সিডির তুলনায় ডিভিডি অনেক ক্ষমতামণী। বর্তমানে হু-রে নামে এক ধরনের ডিভিডি ডিস্ক পাওয়া যায় তথ্য ধারণক্ষমতা সাধারণ ডিভিডির চেয়ে অনেক বেশি।



ডিভিডি ও সিডি, দেখতে একই রকমের

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ও মেমোরি কার্ড (Flash Drive & Memory Card):

যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটারের অনেক তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিতে হয়। সেটা সবচেয়ে সহজে করা যায় নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে। যেখানে নেটওয়ার্ক নেই সেখানে তথ্য নিতে হলে কোনো এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। যে স্টোরেজ ডিভাইসটি সবচেয়ে সহজে বহন করা যায় সেটার নাম পেনড্রাইভ কিংবা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। নাম নুনেই বুঝতে পারছ এটা পেন বা কলমের মতো ছোট এবং পকেটে করে নেয়া যায়।



পেন ড্রাইভ

২০০০ সালের দিকে যখন এগুলো বাজারে আসে তখন ৩২ মেগাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারতো। এখন ৩২ গিগাবাইটের পেনড্রাইভ সহজেই পাওয়া যায়। মূল্যও আগের তুলনায় এখন হাতের নাগালে। এটি সিডি-ডিভিডির তুলনায় টেকেও বেশি দিন। তাই ব্যবহারকারীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর ডিভাইসের পেনড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা পেনড্রাইভ ছাড়াও বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের মাইক্রোচিপ সম্বলিত কার্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলোর নাম মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডেও অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে এটি সরাসরি সংযোগ দেওয়া যায় না। এর জন্য নির্ধারিত ব্রট প্রয়োজন হয় অথবা কার্ড রিডার ব্যবহার করতে হয়। মেমোরি কার্ড নানা আকৃতি ও বিভিন্ন ক্ষমতার হতে পারে। তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় এমপি৩ (mp3) বা এমপি৪ (mp4) ফ্লোর এবং গেমস খেলার যন্ত্রগুলো ছাড়াও সকল ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন বা মার্কিফোনে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

দলগত কাজ

তথ্য সংরক্ষণের জন্য সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ অথবা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কোনটিকে বেশি উপযোগী মনে কর? বুদ্ধিসহ বর্ণনা কর।

 **নতুন শিক্ষাম:** গিগাবাইট, টেরাবাইট, অ্যাম্বিনিয়াম এলয়, সিরামিক, পলিকার্বনেট, লেজার রশ্মি।

পাঠ ১২ ও ১৩: মাদারবোর্ড

মাদারবোর্ড ভোমাদের অভ্যস্ত পরিচিত শব্দ। ইতোমধ্যে মাদারবোর্ডের ছবিও দেখে ফেলেছ। তবু মাদারবোর্ড সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন। যে কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র ভোমরা বলি খুলে দেখ তাহলে একটা বোর্ড সবার নজরে পড়বে। এ বোর্ডটি আসলে একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। এ বোর্ডে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংযোগ দেওয়া থাকে। এ বোর্ড যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছাড়াও বিদ্যুৎ প্রবাহ করার রাখে। এ ধরনের বোর্ড আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে তার দিয়ে যন্ত্রাংশগুলোকে সংযোগ দেওয়া প্রয়োজন হতো। সে এক দেখবার মতো বিষয় ছিল।

কম্পিউটারের এই মাদার বোর্ড— মেইনবোর্ড, সিস্টেম বোর্ড আবার স্টিক অবসের অ্যাংশ কম্পিউটারের



মাদারবোর্ড

ফেলে লজিক বোর্ড নামেও পরিচিত। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এটা হচ্ছে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ইনপুট, মেমোরি, আউটপুট বা স্টোরেজ ডিভাইসসহ সকল যন্ত্রাংশের সংযোগ করার বোর্ড।

একসময় মাদারবোর্ডে প্রসেসর বা সিপিইউ সকেট ছাড়াও ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড, র‍্যাম ইত্যাদি লাগানোর স্লট বা সকেট অবশ্যই দেখা যেতো। তবে ইদানীং কালের মাদারবোর্ডে র‍্যাম ছাড়া অন্যান্য কার্ড (Built in) স্থায়ীভাবে সংযোজিত অবস্থায় থাকে। এতে করে কম্পিউটারের নির্মাণ হয়ে অনেক কমে গেছে। তাছাড়া প্রসেসরের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে অনেক যন্ত্রাংশের কাজ প্রসেসর নিজেই করে থাকে।

মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে সহায়ক চিপসেট (Chipset) যা সিপিইউ-এর সাথে অন্যান্য যন্ত্রপাতির কার্যক্রম সমন্বয় করে। মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এ চিপসেটের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ মাদারবোর্ডটি কোন ধরনের প্রসেসর ব্যবহার উপযোগী তা এ চিপসেটের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

একটি আধুনিক মাদারবোর্ডে অন্যান্য যন্ত্রাংশের সাথে সাধারণত যা যা থাকে সেগুলো হলো :

১. মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ সকেট
২. র‍্যাম স্লট
৩. চিপসেট
৪. র‍্যাম
৫. ক্লক জেনারেটর
৬. এক্সপানশন স্লট এবং
৭. পাওয়ার সংযোগ স্লট।

এছাড়াও বর্তমানে মাদারবোর্ডের সাথে ইউএসবি (USB) পোর্ট, নেটওয়ার্কিং কার্ড ও পোর্ট ইত্যাদিও সংযোজিত অবস্থায় থাকে।

দ্রষ্টব্য

একটি পুরনো নষ্ট কম্পিউটার খুলে মাদার বোর্ডটি লক্ষ কর এবং ঐকে এর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।

*কমপক্ষে একটি শ্রেণি কার্যক্রম এ কাজের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

 **নতুন শিখলাম:** প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, Built in, Chipset, র‍্যাম স্লট, ক্লক জেনারেটর, এক্সপানশন স্লট, নেটওয়ার্কিং কার্ড।

পাঠ ১৪: প্রসেসর

তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কোনটি— প্রায় সবাই বলবে মস্তিষ্ক। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশেই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে থাকে। তেমনি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা এ ধরনের আইসিটি ডিভাইসগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রসেসর। একে সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশও বলা হয়। এখনকার দিনে গাড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, গেম কনসোল, টেলিভিশনসহ সব ধরনের হাইটেক যন্ত্রপাতিই প্রসেসর নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হলো এ প্রসেসর। আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এর উন্নয়ন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বলা যায় অকল্পনীয় গতিতে। মজার ব্যাপার হলো প্রসেসরের উন্নয়নে প্রসেসরেরই সাহায্য নেওয়া হয়। তাই বলা যায় প্রসেসর নিজেই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করে গড়ে তুলছে।

অসংখ্য ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) দিয়ে প্রসেসর তৈরি হয়। আইসিগুলো তৈরি হয় ট্রানজিস্টার (Transistor) দিয়ে। এগুলো সব একটি ক্ষুদ্র চিপ (Chip) এর মধ্যে থাকে। প্রসেসরে আইসির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়লেও চিপ-এর আকার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে। আকার ছোট হলেও এর কাজ করার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণের কাজ সিপিইউ-এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সফটওয়্যারের নির্দেশ বোঝা এবং সে অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়া করা এর কাজ। অর্থাৎ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের কাজটি সিপিইউ বা প্রসেসর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক কথায় কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় করে কাজ সমাধা করে প্রসেসর। তিনটি অংশের সমন্বয়ে প্রসেসর গঠিত হয়।

১. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmetic and Logic Unit): এ অংশে গাণিতিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয়।

২. নিয়ন্ত্রক অংশ (Control Unit) : এ অংশের মাধ্যমে সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ পালিত হবে তা নির্ধারিত হয় এ অংশে। এবং

৩. রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory): এটি ছোট আকারের অত্যন্ত দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্মৃতি। এ স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়।

আমরা জানি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭১ সালেই ইন্টেল প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করে। যার নাম দেওয়া হয়েছিল ৪০০৪। এটির উদ্ভাবক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেড হফ, স্ট্যান মেজর, ফেডরিকো ফ্যাগিন এবং জাপানের মাসাতোশি শিমা।

তোমরা আগেই জেনেছ জন্মের পর থেকেই প্রসেসরের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসরে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ছিল ২৩০০টি আর বর্তমানের কোর আই সেভেন প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ২২৭,০০,০০,০০০টি! ভবিষ্যতের কথা কল্পনা কর!

পৃথিবীর নানা জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে-আদেশ-নির্দেশ দেয় তার সবই কম্পিউটার ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু কীভাবে সবার ভাষা কিংবা নির্দেশ কম্পিউটার বুঝে ফেলে?— এই প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য নিচয়ই তোমাদের মন ঝাঁকুপাঁকু করেছে। এর সহজ উত্তর হচ্ছে কম্পিউটার তথা প্রসেসর আসলে কারও ভাষাই বোঝে না। সে তার নিজের ভাষাই শুধু বোঝে। কম্পিউটারের ভাষায় কেবলমাত্র দুটো অক্ষর ‘০’ এবং ‘১’। ‘০’ মানে হচ্ছে ০ থেকে ২ ভোল্ট বিদ্যুৎ আর ‘১’ মানে হচ্ছে ৩ থেকে ৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ। এ ভাষার নাম মেশিন ভাষা (Machine Language)। ধর তুমি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পার কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি না জানা ফরাসী ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে চাও— এক্ষেত্রে একজন দোভাষীর সাহায্য নিয়ে কথা বলতে হবে। তেমনি প্রসেসরকে আমাদের ভাষা বোঝাতে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।



প্রসেসর

আমাদের তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার প্রতিটি অক্ষর ও প্রতীকের জন্য মেশিন ভাষার নির্দিষ্ট কোড রয়েছে। অনুবাদক প্রোগ্রাম আমাদের ভাষাকে প্রসেসর বা মেশিনের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে। নানা ধরনের কোড রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের কথা উল্লেখ করা যায়। ASCII কোড ৮ বিটের কোড। এ কোড অনুযায়ী

A = ০১০০০০০১

B = ০১০০০০১০

? = ০০১১১১১১

, = ০০১০১১০০

ইত্যাদি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কোড হলো Unicode। তোমরা যখন প্রোগ্রামার হবে তখন অনেক ভাষার সাথে মেশিনের ভাষাও তোমাদের জানা হয়ে যাবে।

দর্শনীয় কাজ

প্রসেসরের ভাষা ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।



নতুন শিখলাম: IC, Transistor, Chip, Arithmetic and Logic Unit, Control Unit,

Register Memory, ASCII কোড, Unicode.

পাঠ ১৫: ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

সাইন্ড কার্ড (Sound Card): আজকের দিনের আইসিটি যন্ত্রগুলোতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই থাকে তা হলো সাইন্ড কার্ড। এটি একই সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে। এটি সাধারণত সকেটওয়ার দিগে নিরঙ্কিত হয়।

বেশিরভাগ সাইন্ড কার্ড ডিজিটাল উপাত্তকে এনালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। প্রায় সব সাইন্ড কার্ডেই ইনপুট দেওয়ার কানেক্টর এবং আউটপুট দেওয়ার কানেক্টর থাকে। বাইরে থেকে



সাইন্ড কার্ড (মোজার্ট ১৬)

মাইক্রোফোন বা অন্যকোনো ইনপুট দেওয়ার যন্ত্রে ইনপুট দিলে সাইন্ড কার্ড তা প্রসেস করে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটকে প্রক্রিয়া করে আবার সাইন্ড কার্ডে পাঠায়, সেখান থেকে আউটপুট অংশের মাধ্যমে হেডফোন বা স্পিকারে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

ইদানীং কালে বেশিরভাগ সাইন্ড কার্ডই মাদারবোর্ডে সংযুক্ত (Built in) অবস্থায় থাকে। আলাদা করে সাইন্ড কার্ড লাগাতে হয় না। সাইন্ড কার্ডের মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া পূর্ণতা পায়। গান শোনা, চলচ্চিত্র উপভোগ করা ছাড়াও নব পেমস্ আমরা শব্দসহ উপভোগ করি সাইন্ড কার্ডের কারণেই। তবে প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত সাইন্ড কার্ড সাধারণত আলাদা করে মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়।

গ্রাফিক্স কার্ড (Graphics Card): তোমরা যখন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার কর তখন পর্দায় ছবি দেখেই নানা নির্দেশনা দিগে থাক। এখন প্রশ্ন হলো এ ছবি পর্দায় দেখা যায় কীভাবে? আসলে কাজটি করে থাকে গ্রাফিক্স কার্ড। এটিকে অনেক সময় ভিডিও কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড বা গ্রাফিক্স এডাপ্টার নামে ডাকা হয়।

মাদারবোর্ডে এই কার্ড লাগানোর জন্য আলাদা স্লট বা সকেট থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এ কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আর অত্যাধুনিক প্রসেসরগুলোতে এ ভিডিও বা ডিসপ্লে চিপ সংযুক্ত থাকে বা অন্য কথায় প্রসেসরগুলো কোনো কার্ড ছাড়াই আমাদের ছবি প্রদর্শন করতে পারে।

সব গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের দ্বিমাত্রিক (২ডি) ছবি দেখাতে পারে। তবে বর্তমানে ত্রিমাত্রিক (৩ডি) ছবি দেখাতে সক্ষম গ্রাফিক্স কার্ডও পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে হলে আমাদের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাতে সক্ষম মনিটর প্রয়োজন হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এ উন্নতির ফলে আজকের দিনে আমরা একেবারে জীবন্ত ও বাস্তব ছবি দেখতে পারছি।



গ্রাফিক্স কার্ড

সাইন্ড কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডেও ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টার থাকে। এছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ডে গেমস্ খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে। ফলে সহজেই গেমস্ খেলার জন্য জয়স্টিকস্ বা অন্যান্য যন্ত্র সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

দক্ষগত কাজ

সাইন্ড কার্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আর কী ধরনের আউটপুট কার্ড হলে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়? দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

 **নতুন শিখনাম:** এনালগ, অ্যানালগিকার, এডাপ্টার, দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক।

পাঠ ১৬ ও ১৭: ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

মনিটর (Monitor): মনিটর মূলত একটি আউটপুট ডিভাইস। এখন এমন মনিটরও পাওয়া যায় যা একইসাথে ইনপুট ডিভাইস হিসাবেও কাজ করতে পারে। তোমরা নিচেরই বুঝে গেছ এখানে টাচস্ক্রিন মনিটরের কথা বলা হচ্ছে। আজকাল টাচস্ক্রিনসহ মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা সাধারণ মনিটর সবখানেই পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই হয়তো এরমধ্যে এসব ব্যবহারও করে ফেলেছ।



সিআরটি মনিটর, এলসিডি মনিটর ও এলইডি মনিটর

আমাদের বাসার টেলিভিশনের সাথে মনিটরের তেমন পার্থক্য নেই। নানা আকৃতির মনিটর পাওয়া যায়। মনিটরের কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। আগে সিআরটি বা ক্যাথোড রে টিউব (Cathod Ray Tube) মনিটরই সবাই ব্যবহার করত। এখন পাতলা এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) বা এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োড) পর্দার মনিটর ব্যবহৃত হয়। এগুলো হালকা পাতলা। দেখতে আকর্ষণীয় এবং বিদ্যুৎ খরচ সিআরটি মনিটরের তুলনায় অনেক কম।

প্রিন্টার (Printer): মনিটরের পর যে আউটপুট যন্ত্রটি আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে প্রিন্টার। কম্পিউটারে প্রসেসিং করার পর এর আউটপুট কাগজে ছাপানোর জন্য আমাদের প্রিন্টার ব্যবহার করতে হয়। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিও আমরা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে থাকি। সাধারণত তিন ধরনের প্রিন্টার পাওয়া যায়।



ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

ক. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার: এটি প্রথম দিকের প্রিন্টার। ছাপার ব্যয় অনেক কম সেক্ষেত্রে এ প্রিন্টারটি এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায় না। তাছাড়া এটির ছাপার গতি অনেক ধীর।

খ. ইন্কজেট প্রিন্টার: স্বল্পমামি প্রিন্টার হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে ইন্কজেট প্রিন্টার বেশি ব্যবহার করা হয়। এটিতে তরল কালি ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায়। বিশেষ করে ছবি প্রিন্ট করার কাজে ইন্কজেট প্রিন্টারের ব্যবহার অধিক। তবে এর ছাপার ব্যয় ছুটনামূলক বেশি।



ইন্কজেট প্রিন্টার



লেজার প্রিন্টার

গ. লেজার প্রিন্টার: নাম দেখে নিচুই বুঝে ফেলেছ এর সাথে লেজারের সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপা হয়। লেজার প্রিন্টারের ছাপার গতি ও মান অত্যন্ত উন্নত ও নিখুঁত। সাধারণ ছাপা এবং ছবি প্রিন্ট উভয় ধরনের কাজেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। একসময় ব্যয়বহুল থাকলেও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে এটি এখন অনেক ব্যয়-সস্তরী।

এছাড়াও প্রিন্টারও একটি ছাপার যন্ত্র। আর্কিটেকচারাল নকশা, মানচিত্র বা গ্রাফের নিখুঁত ও অনেক বড় কাগজে প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

দলগত কাজ

তোমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের প্রিন্টার উপযুক্ত, দলে আলোচনা করে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

নতুন শিখার: সিলারটি বা কেবল রে টিউব, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, লাইট ইমিটিং ডায়োড, আর্কিটেকচারাল নকশা।

পাঠ ১৮: আউটপুট ডিভাইস

স্পিকার: তোমরা সবাই নিশ্চয়ই গান শুনতে অনেক পছন্দ কর। গান শোনার যন্ত্রগুলোর সাথে বা অবশ্যই সংজ্ঞা থাকে তাই হলো স্পিকার। স্পিকার আমাদের সব ধরনের শব্দ শোনাতে পারে। এটি একটি আউটপুট ডিভাইস। মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হলো স্পিকার। স্পিকার কম্পিউটারের ভিতরে স্থাপিত অবস্থায় থাকতে পারে আবার বাইরে লাগানো যায়। ভালো মানের শব্দ পেতে হলে আমাদের ভালো স্পিকার ব্যবহার করতে হয়। সঠিক কার্ড বা গ্রিসিটার থেকে সূর্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে প্রকাশযোগ্য শব্দরূপে রূপান্তরিত করা স্পিকারের কাজ।



স্পিকার



হেডফোন

হেডফোন: হেডফোন হলো কানের কাছাকাছি নিয়ে শব্দ শোনার যন্ত্র। একে অনেক এয়ারকোন বা হেডসেট নামেও ডেকে থাকে। এটিও আউটপুট ডিভাইস। সাধারণত মোবাইল ফোন, সিডি/ডিভিডি প্রেরার, এমপিথ্রি/এমপিফোর প্রেরার, দ্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করা হয়। একাকী ব্যবহার করা হয় বলে এতে অন্যের বিরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে হেডফোনের বহুল ব্যবহার বিশেষ করে উচ্চশব্দে বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আমাদের শ্রবণ ইন্সট্রিমেন্টের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বর্তমানে ডারবিহীন হেডফোন অনেকই ব্যবহার করে। এগুলো ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের শব্দ শোনায়ে।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর হলো একটি ইলেকট্রো অপটিক্যাল যন্ত্র। এর সাহায্যে কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভিড উইথ থেকে নেওয়া ডেটা ইমেজে রূপান্তর করা যায়। এ ইমেজ লেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে বহুগুণে বিবর্ধিত করে দূরবর্তী স্ক্রীনে বা স্ক্রিনে কেলে উজ্জ্বল ইমেজ তৈরি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। আধুনিক প্রজেক্টরগুলো ত্রিমাত্রিক ইমেজও তৈরি করতে সক্ষম।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সাধারণত প্রজেক্টেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্লাইড প্রজেক্টর এবং ওভারহেড প্রজেক্টরের আধুনিক রূপ। এটি ডিজিটাল ইমেজকে যে কোনো সমতলে যেমন— স্ক্রীন বা

ডেস্কের উপর বড় করে ফেলাতে সক্ষম। বিশাল সভাকক্ষে ব্যবহারের জন্য এর উচ্চলয় এক হাজার থেকে চার হাজার লুমেনের হতে হয়। এটি ল্যাম্পের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।




মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

এলসিডি প্রজেক্টরগুলোর ল্যাম্প সাধারণত চার হাজার ঘণ্টা ব্যবহারের পর পরিবর্তন করতে হয়। আরেক ধরনের প্রজেক্টর রয়েছে যা এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এগুলোর ল্যাম্প বিশ হাজার ঘণ্টা কাছ করতে পারে। তবে এগুলোর মূল্য স্থানানুসঙ্গভাবে অনেক বেশি। কম্পিউটার বা অন্য কোনো উৎস যেমন : টেলিভিশন, সিডি/ভিডিও প্রেমার ইত্যাদি থেকে ইমেজ নিয়ে তা এলসিডিতে সরবরাহ করে। এরপর ইমেজটি একটি লেন্সের মাধ্যমে সমতল পৃষ্ঠের ওপর ফেলা হয়। এজন্য বড় কোনো আসবাবের প্রয়োজন পড়ে না। এলসিডি বা এলইডি প্রজেক্টর আকারে ছোট বলে খুব সহজেই বহনযোগ্য। বর্তমানে পকেট প্রজেক্টর পাওয়া যায় বা কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি বা মোবাইল ফোন থেকে ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

মঙ্গলত কাজ

যে ডিভাইসগুলো আলোচনা করা হলো এর বাইরে তোমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইনশুট ও আউটশুট ডিভাইসের একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন কর।

 **নতুন শিকশাম:** শব্দভরঙ্গ, ব্রুথ, ওয়াইফাই, লুমেন, এলসিডি, এলইডি।

তৃতীয় অধ্যায়

নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

১. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. সামাজিকক্ষেত্রে এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আইন ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৫. মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কার্টুন আঁকতে পারব।

পাঠ ১৯: সচেতন ব্যবহার

তোমাকে যদি একটা ছোট কাঠি দিয়ে একটা পাছের ডাল কাটতে কা হর- ভূমি সারাদিন চেঁচা করে খুটিয়ে খুটিয়ে বড়জোর পাছের বাকল একটুখানি ভুলতে পারবে- তার বেশি কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে যদি একটা ধারালো দা দেয়া হয়- কয়েক কোপ দিয়েই ভূমি পাছের ডালটা কেটে ফেলতে পারবে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ কর, ছোট কাঠিটা যদি ভূমি অসতর্কভাবে ব্যবহার কর তোমার হাতে পায়ে বড়জোর একটু খোঁচা লাগতে পারে- কিন্তু ধারালো দা অসতর্কভাবে ব্যবহার করলে ভুল জায়গায় কোপ লেগে ভয়াবহ রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।

ছোট কাঠি থেকে ধারালো দায়ের ক্ষমতা অনেক বেশি তাই সচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করে অনেক বড় কাজ করা যাবে- কিন্তু অসচেতনভাবে সেটা ব্যবহার করলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। এটা সবসময় মনে রাখবে- জীবনের সবকিছুর বেলাতেও এটা সত্যি। সবচেয়ে বেশি সত্যি এটা তথ্য প্রযুক্তির বেলায়- এই প্রযুক্তিটির ক্ষমতা কত সেটা নিশ্চয়ই ভূমি এখন অনুমান করতে শুরু করেছে, তাই ভূমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে এটাকে ভুল করে ব্যবহার করলে অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।



সবার চোখের আড়ালে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে না।



অপরিচিত মানুষকে নাম-পরিচয়-ছবি পাশপোর্ড দেবে না।

কাজেই প্রথমেই আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে, আমরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করব- কিন্তু সেটি ব্যবহার করব খুব সচেতনভাবে যেন কখনো কোনো সমস্যা না হতে পারে অনেকের কাছেই কম্পিউটারের মূল ব্যবহার হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। এই ইন্টারনেটে পৃথিবীর সব কম্পিউটার যুক্ত আছে তাই কেউ যখন ঘরের ভেতরে বসে কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তখন হঠাৎ করে পুরে পৃথিবীটা যেন তোমার ছোট ঘরের ভেতর হাজির হয়। এই পৃথিবীতে যেরকম অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে- যেখানে তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে, ঠিক সেরকম অনেক ভয়ংকর

বিপজ্জনক জায়গা আছে- যেখান থেকে তোমার একশ হাত দূরে থাকতে হবে। ইন্টারনেটের বেলাতেও তোমাদের সাথে একই ব্যাপার ঘটে, তোমার চোখের সামনে অনেক চমৎকার গুয়েবসাইট রয়েছে যেট ভূমি উপভোগ করবে আবার তার পাশাপাশি অনেক বিপজ্জনক গুয়েবসাইট রয়েছে যেগুলো কোনোভাবেই তোমার দেখা উচিত না।

শুধু যে গুয়েবসাইট তা নয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে তুমি যখন অন্যদের সাথে যোগাযোগ কর তখন হঠাৎ করে শুধু পরিচিত মানুষ নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সাথেও যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। না বুঝে কোনো অপরিচিত মানুষের সাথে সরল বিশ্বাসে যোগাযোগ করে তুমি যদি আবিষ্কার কর মানুষটি আসলে একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেটে হানা দিয়েছে? মানুষটিকে তুমি যদি তোমার নাম ঠিকানা, ফোন নম্বর ছবি দিয়ে বসে থাক আর সেই মানুষটি যদি সেগুলো কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তখন তুমি কী করবে?

কাজেই কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রথম নিয়মটিই হচ্ছে কখনো অপরিচিত মানুষকে নিজের পরিচয় নাম ঠিকানা আর পাসওয়ার্ড দিতে হয় না।

ইন্টারনেটে অপরিচিত মানুষদের যোগাযোগ করার অনেক রকম বিপদ হতে পারে, যেহেতু কেউ দেখছে না, তাই তাদের কথাবার্তা অনেক সময় অসংযত হয়ে যেতে পারে, শালীনতা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সত্যিকার জীবনে আমি যদি অসংযত বা অশালীন ব্যাপার না দেখি তাহলে সাইবার জগতে কেন সেটি দেখব?



ইন্টারনেটে অন্যের সাথে হুড়, অসংযত, অশালীন হবে না।


সবকিছুতেই বয়সের একটা ব্যাপার আছে— তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমার বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা বইগুলো পড়তে তোমার ভালো লাগে, বড়দের জন্যে লেখা বইগুলো তত ভালো নাও লাগতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় সেটা পড়তে গিয়ে তার বিষয়বস্তুর কারণে তুমি রীতিমত ধাকা খেতে পার। সাইবার জগতে সেটা হতে পারে, হঠাৎ করে তোমার সামনে যদি এমন কিছু চলে আসে যেটা মোটেও তোমার বয়সের উপযোগী না, তুমি রীতিমতো ধাকা খেতে পার— তোমার মনটাই বিবিধে যেতে পারে। কাজেই সতর্ক ধাকা ভালো।

তোমরা যারা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার কর তারা নিচের তিনটি নিয়ম মেনে চল, দেখবে কখনো কোনো সমস্যা হবে না।

- (১) ইন্টারনেট কখনো একা অন্যদের চোখের আড়ালে ব্যবহার করবে না, এমন জায়গায় বসে ব্যবহার করবে যেখানে সবাই তোমার কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখতে পায়।
- (২) ভুলেও কোনো অপরিচিত মানুষকে নিজের নাম পরিচয় ছবি বা পাসওয়ার্ড দেবে না।
- (৩) ইন্টারনেট ব্যবহার করবে আনন্দের জন্যে, কারো ক্ষতি করার জন্যে নয়— তোমাকে হয়তো দেখছে না তবুও কখনো অসংযত হবে না, রুচ হবে না, অশালীন হবে না।

দলগত কাজ

- (১) কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ছাড়াও তোমার জীবনে ব্যবহার করা আর কী কী প্রযুক্তি সচেতনভাবে ব্যবহার করা উচিত তার একটা তালিকা কর।
- (২) ইন্টারনেট ব্যবহার করার তিনটি নিয়ম লিখে একটি সুন্দর পোস্টার তৈরি কর।

 **নতুন শিক্ষণীয় :** সাইবার জগৎ, বিপজ্জনক গুয়েবসাইট, পাসওয়ার্ড।

পাঠ ২০-২২: আসক্তি

২০০৯ সালে চীন দেশে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, সম্পর্কে তারা স্বামী স্ত্রী। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারণ তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিক্রি করে দিয়েছে। সবমিলিয়ে তিন তিন জন ছেলেমেয়েকে বিক্রি করেছে আনুমানিক ৯০০০ ডলারে। তোমরা যারা খবরের কাগজ পড় মাঝে মাঝে আমাদের দেশেও হয়তো এরকম খবর তোমাদের চোখে পড়েছে, যেখানে কোনো একজন অসহায় মা, নিজের সন্তানদের মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্য কাউকে তার নিজের সন্তানকে দিয়ে দিচ্ছে। আমরা যখন এরকম খবর পড়ি, তখন আমাদের মন খারাপ হয়। আমরা তখন স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে আমাদের দেশটি এমন একটি দেশ হবে যেখানে আর কখনো কোনো অসহায় মা'কে এরকম কিছু করতে হবে না।

চীন দেশের স্বামী স্ত্রীর ঘটনা কিন্তু মোটেও সেরকম কোনো ঘটনা নয়— তারা তাদের বাচ্চাদের বিক্রি করেছে কম্পিউটার গেম খেলার জন্য। তাদের দু'জনেরই এমএমও (Massively multiplayer online game) নামে এক ধরনের কম্পিউটার গেম খেলার জন্যে আসক্তি জন্মেছে, সেই আসক্তি এত তীব্র যে সেটি খেলার খরচ জোগাড় করার জন্যে তারা তাদের নিজের সন্তানদের বিক্রি করে দিয়েছে।



নিউজ মিডিয়াতে চীন দেশের এক দম্পতির সন্তান বিক্রি করে দেয়ার খবর।

এটি খুবই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং যখন এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয় তখন এটা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। পৃথিবীর মানুষ তখন আতর্ষিত হয়ে আবিষ্কার করেছিল যে কম্পিউটার গেমের এমন আসক্তি ছন্দে যেতে পারে। এ আসক্তির জন্য সাধারণ কাঙ্ক্ষান পর্বস্ত উধাও হয়ে যায়। আমাদের সবারই এটা মনে রাখা দরকার। কোনো কিছু ভালোলাগা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আমাদের ভালো লাগে, আমরা ভালো লাগার কাজটি করার চেষ্টা করি, তাই আমাদের জীবন এত সুন্দর। কিন্তু আসক্তি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। তার মাঝে ভালো কিছু নেই! কেউ যখন কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যায় তখন তার কাছে যুক্তি কাজ করে না। সে সম্পূর্ণ অরৈখিকভাবে সেই কাজটি করতে থাকে। মাদক হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ— যখন কেউ মাদকে আসক্ত হয়ে যায় তখন সে তার ভয়ঙ্কর আকর্ষণ থেকে বের হতে পারে না। তার নিজের এবং আশপাশে যারা আছে তাদের সবার জীবন সে ধ্বংস করে দেয়।

কম্পিউটার গেমের আসক্তিও ঠিক সে ধরনের হতে পারে। তোমরা যারা কম্পিউটার গেম খেলেছো কিংবা যারা হয়তো ভবিষ্যতে কম্পিউটার গেম খেলবে তাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে— তোমরা যেন বিষয়টা উপভোগ করতে পার কিন্তু কোনোভাবেই যেন আসক্ত না হয়ে পড়।



হোট পিপুরা সহজেই কার্টুন আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

কোনো একটা বিষয়ে আসক্ত হয়েছ কী না সেটা কীভাবে বোঝা সম্ভব? কাজটি মোটেও কঠিন নয়— যখনই দেখবে কেউ একজন কোনো একটি কাজে যাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছে তখনই বুঝবে সে সেই কাজে আসক্ত হয়ে গেছে। আমাদের দেশে টেলিভিশনে অনেক রকম কার্টুন দেখায়— তোমরা সবাই সেইসব কার্টুন দেখেছো, দেখে হয়তো হাসিতে কুটি কুটি হয়েছো। যখন টেলিভিশনের সামনে থেকে উঠে এসেছ সেই কার্টুনের কথা ভুলে অন্য

কোনো কাজে মন দিয়েছ। কিন্তু যদি এরকম হয় যে তুমি টেলিভিশন ছেড়ে উঠতে পারছ না কিংবা যখনই টেলিভিশনের সামনে আস তখনই টেলিভিশনে কার্টুন দেখ এবং তোমার জন্যে অন্যেরা টেলিভিশনে অন্য কিছু দেখতে পারে না তখনই তুমি বুঝবে যে তোমার আসক্তি জন্মাতে শুরু করেছে। তোমার তখনই সতর্ক হওয়া মরকর। অনেক বাসাতে বাবা—মায়েরা এই বিষয়টি ভালো করে বুঝেন না। তারা ছোট বাচ্চাদের শান্ত রাখার জন্যে কার্টুন চ্যানেল খুলে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে রেখে দেন। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে যায় যে ছোট বাচ্চাটি কার্টুন ছাড়া আর কিছু বুঝতেই পারে না। তাকে টেলিভিশনের সামনে থেকে সরানো যায় না এবং এটি বাচ্চাটির মানসিক বিকাশে অনেক বড় সমস্যা হতে পারে।

শুধু যে কার্টুন চ্যানেল বা কম্পিউটার গেম আসক্তি হতে পারে তা নয়, কোনো এক ধরনের খাবারেও আসক্তি হতে পারে। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে ক্রিটেনের একটি মেয়ে পিৎজা ছাড়া আর কোনো কিছু খেতে পারে না। গত একত্রিশ বছর থেকে সে সকালের দাস্তান, দুপুরের লাঞ্চ, রাতের ডিনার বা দুটো খাবারের মাঝখানে কিছু খেলেও সে শুধু পিৎজা খায়। সে বেহেতু আর কিছু খায় না, খেতে পারে না। তাই এটাও খুব বড় ধরনের আসক্তি।

কাজেই তোমাদের সবারই খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনো কিছুতে তোমাদের আসক্তি জন্মে না যায়। বেহেতু একবার আসক্তি হয়ে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব কঠিন। তাই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোনো কিছুতেই কোনোভাবে আসক্ত না হওয়া।

দলগত কাজ

কম্পিউটার গেমের আসক্তির তয়াবহতা নিয়ে একটি নটিক লিখে সবাই মিলে অভিনয় কর।

এক সময় আসক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হতো জুয়া খেলা বা মাদক ব্যবহার এরকম বিষয়ের জন্যে। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে এখন অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারও আসক্তি হিসেবে ধরা শুরু হয়েছে। যারা খুব বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের জন্যে IAD বা Internet Addiction Disorder নামে একটা নতুন নাম পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে।

আজকাল অনেকেই কমবেশি কম্পিউটার ব্যবহার করে। কাজেই প্রথমেই বুঝতে হবে কোন ব্যবহারটা হচ্ছে প্রয়োজনে আর কোনটা হচ্ছে আসক্তি। একজন যখন তার মা বাবা ভাই বোন কল্পে বাস্তবকে সময় না দিয়ে সেই সময়টাও কম্পিউটারের পিছনে দেয় তখন বুঝতে হবে তার কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে। যখন কম্পিউটারে আসক্তি হবে তখন দেখা যাবে তার কাজকর্মে ক্ষতি হচ্ছে, লেখাপড়ায় সমস্যা হচ্ছে। যখন আসক্তি আরো বেড়ে যাবে তখন দেখা যাবে মানুষটি ঠিকমত না ঘুমিয়ে সেই সময়টা কম্পিউটারের পিছনে বসে আছে- তখন তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে শুরু করে। যেহেতু কম্পিউটার নিয়ে সাধারণ মানুষের খুব ভালো ধারণা তাই অনেক সময় বাবা-মায়েরা কম্পিউটারের আসক্তির ব্যাপারটা বুঝতে



আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করব। কম্পিউটার যেন আমাদের ব্যবহার করতে না পারে।

পারেন না। কোনো কিছু বাড়াবাড়ি ভালো নয়, কম্পিউটার ব্যবহারেরও নয়, এটি সবাইকে বুঝতে হবে।

কম্পিউটার আসক্তির কুফল কী হতে পারে? কিছু কিছু বিষয় খুব স্পষ্ট। কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠার জন্যে মাঠে ঘাটে ছোটাছুটি করতে হয়, খেলাতে হয়। যে সময়টা খেলার মাঠে ছোটাছুটি করে খেলার কক্ষা, সেই সময়টাতে তারা যদি ঘরের কোনায় কম্পিউটারের সামনে মাথা গুঁজে বসে থাকে তাহলে সেটা তার জন্যে মোটেই ভালো একটি ব্যাপার নয়। যারা সত্যিকারভাবে কম্পিউটারে আসক্ত হয়ে যান, দেখা যায় তারা কম্পিউটারের বাইরে চিন্তাও করতে পারে না। তারা শুধু যে সেটা নিয়ে সময় কাটায় তা নয়, সেটার পেছনে নিজের কিংবা বাবা-মায়ের টাকাও খরচ করাতে শুরু করে।

যে কোনো আসক্তির জন্যে একটা কক্ষা সত্যি, একবার কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন। কাজেই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সবারই জানতে হবে

কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র, তার ব্যবহার যেন হয় প্রয়োজনে— কখনোই যেন তাতে আসক্তি জন্মে না যায়।

কখনো যদি সত্যি সত্যি আসক্তি জন্মেই যায় তখন সেখান থেকে তাকে বের করে আনার জন্যে সবারই একটা দায়িত্ব থাকে। সেজন্যে যে মানুষটির কম্পিউটারে আসক্তি জন্মেছে তাকে কম্পিউটারের বাইরের জগৎ থেকেও আনন্দ পাওয়া শিখিয়ে দিতে হবে— সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে খেলাধুলা। যার আসক্তি জন্মেছে তাকে সময় ঠিক করে নিতে হবে— দিনে কতক্ষণ সে কম্পিউটার ব্যবহার করবে। যেমন, এক ঘন্টার বেশি নয়। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো একটি কাজ করে তাকে কম্পিউটার ব্যবহারের সেই সময়টুকু অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে— কম্পিউটার খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। আমরা সেটাকে ব্যবহার করব, কিন্তু সেটা যেন কখনো আমাদের ব্যবহার না করে।

দলগত কাজ

কম্পিউটারে আসক্ত একটি ছেলে বা মেয়ে সারাদিন কীভাবে দিন কাটায়, সেটি নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প লেখ।

আজকাল তথ্য প্রযুক্তির জগতে নতুন এক ধরনের আসক্তি দেখা দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এরকম অনেক ধরনের সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেমন: ফেসবুক, টুইটার, লিংকড-ইন, সুমাজি ইত্যাদি। ফেসবুক ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে এবং এর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

এত বিশাল সংখ্যক মানুষ যে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তার গুরুত্বটা নিশ্চয়ই খুব সহজে বোঝা যায়। মানুষের ভেতরে কোনো একটা তথ্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে এই নেটওয়ার্কগুলোর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সরকার জোর করে দেশটাকে শাসন করে এবং অনেক সময় এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাধারণ জনগণ সংগঠিত হয় এবং রীতিমত আন্দোলন শুরু করতে পারে। তোমরা শুনে অবাক হবে আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশের সৈরশাসক বা সামরিক শাসককে আন্দোলন করে সরিয়ে দেয়ার পিছনে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা যখন অনেক মানুষের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চাই তখন মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষের কাছেই এই সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্যগুলো পাঠিয়ে দেয়া যায়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আজকাল মানুষজন একে অন্যের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখে। কমবয়সীরা তথ্য প্রযুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে বলে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো কমবয়সীদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যোগ দেয়া যায় না কিন্তু তারপরেও অনেক কমবয়সীরাও নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিয়ে দেয় এবং সেটা থামানোর খুব সহজ উপায় নেই। তোমরা হয়তো যুক্তি দিতে পার কোনো একটা বিষয় যদি ভালো হয় তাহলে ছোটরা সেটাতে যোগ দিলে ক্ষতি কী? আমরা তো কমবয়সীদের খবরের কাগজ পড়তে নিষেধ করি না, টেলিভিশন দেখতে বাধা দিই না তাহলে সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দিতে আপত্তি করব কেন?

এর অবশ্যি করেকটা কারণ আছে, প্রথম কারণ হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনকে সামান্যসামানি দেখতে পার না তাই ছোটরা তাদের সাথে সামাজিকভাবে মিশছে তা অনেক সময় বোঝা যায় না। একটা মানুষ বন্ধন শিশু থেকে বড় হয় তখন সবসময়েই সে তার নিজ বয়সীদের সাথে সময় কাটায় এবং সেটাই হচ্ছে সঠিক, তাই যদি কখনো দেখা যায় কমবয়সী ছেলে মেয়েরা ধাতু বয়স্ক বড় মানুষের সাথে ওঠাবলা করছে তখন সেটা কমবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যে ভালো নাও হতে পারে।

শুধু ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড়দের জন্যে যেটা এখন সমস্যা হয়ে পাকিয়েছে সেটা হচ্ছে এই সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি। অনেক সময় দেখা গিয়েছে মানুষজন এই সামাজিক নেটওয়ার্কে বসে একজন আরেকজনের সাথে তথ্য বিনিময় করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুরো বিবরণটা এত সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, কোনো মানুষ সত্যিকার অর্থে কোনো কাজ না করে ফটার পর ফটা সামাজিক নেটওয়ার্কে পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত কিংবা অপরিচিত মানুষের সাথে কাটিয়ে দিতে পারে। বিবরণটা বড় সমস্যা হয়ে গেছে বলে অনেক জায়গাতে অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জোর করে কোনো কিছু ব্যবহার করতে না দেয়া এক ধরনের সমাধান হতে পারে কিন্তু সেটা ভালো সমাধান না। ভালো সমাধান হচ্ছে বন্ধন কোনো মানুষ তার নিজের বিচার বিবেচনা বৃদ্ধি দিয়ে কোনো কিছু পরিমিতভাবে করে। আসক্ত হয়ে লাগাম ছাড়াতাবে তা করে না।



সামাজিক নেটওয়ার্কে বন্ধু আর সত্যিকারের বন্ধুর মাঝে অনেক পার্থক্য।

সামাজিক নেটওয়ার্কে থেকে মানুষজনের অসামাজিক হয়ে যাবারও এক ধরনের আশংকা থাকে। তারা একে অন্যের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্ক করে তারা অনেক সময় নিজেরা একে অন্যকে “বন্ধু” বলে বিবেচনা করে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে একজন আরেকজনের কাছে তথ্য পাঠানোকেই বন্ধুত্ব বলে মনে করে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব আরো অনেক গভীর অনেক বেশি আন্তরিক, অনেক বেশি বাস্তব। কাজেই তথ্য প্রযুক্তির বন্ধুত্বকে সত্যিকার বন্ধুত্ব মনে করে কেউ যদি তাতেই সবুট হয়ে যায় তাহলে সে তার জীবনের অনেক বড় কিছু থেকে বঞ্চিত হবে।

দলগত কাজ

ক্রাশের দুটি দলে ভাগ হয়ে জোমাদের ক্রাশের ছেলেমেয়েদের সামাজিক নেটওয়ার্কে যোগ দেয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।

নতুন শিখান: এমএমও, আসক্তি, Addiction, Disorder, IAD, স্নৈরশাসক, কেসবুক, ইউটার, লিকেন্ড-ইন, সুমাজি।

পাঠ ২৩: কপিরাইট

মানুষের জীবনযাপনে দুই ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। এর একটি আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যেটি স্পর্শ করা যায়, যেমন: বাড়ি, গাড়ি, টাকা-কড়ি, জামা কিংবা খাবার। এগুলো মানুষের জাগতিক, তবে শুধু এসবেই মানুষ তৃপ্ত থাকে না। তাকে তার মানবিক গুণকেও লালন করতে হয়। সে গান শোনে, কবিতা আবৃত্তি করে, সিনেমা দেখে, ছবি আঁকে, ছবি তুলে কিংবা কম্পিউটারে গেম খেলে বা অন্য কোনো কাজ করে। এসব বুদ্ধিভিত্তিক কাজের মাধ্যমেও সম্পদ সৃষ্টি হয় যাকে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ। মানুষ স্বভাবতই তার সব ধরনের সম্পদকে আঁকড়ে রাখতে চায়, রক্ষা করতে চায়। বস্তুজগতের সম্পত্তিগুলো এমন যে, কেউ চাইলেই সেটি নিয়ে যেতে পারে না, বা আরেকটা একই রকমভাবে বানাতে পারে না। কোনো লোক ইচ্ছে করলে কি আলাদিনের দৈত্যকে দিয়ে তোমার বাড়িটা তুলে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। কারণ সেটি একদিকে সম্ভব নয় আবার অন্যদিকে আইনও সেটা করতে দেবে না। অথচ ধরো তুমি সুন্দর একটি গান লিখে সেটিতে সুর করলে। তারপর তোমার বন্ধুদের শোনালে। তখন তোমার বন্ধুদের একজন ইচ্ছে করলে সেটি অন্যদের কাছে নিজের গান বলে চালিয়ে দিতে পারে। আবার নিজের নামে দাবি না করলেও এমনকি তোমার অনুমতি ছাড়া সেটি সে বিভিন্ন স্থানে গাইতে পারে। তুমি একটা সুন্দর কবিতা লিখলে, সেটিও কেউ একজন তোমার অনুমতি ছাড়া কোথাও ছাপিয়ে দিতে পারে। এরকম যদি হয় তাহলে সেটি সমাজের জন্য সুন্দর হয় না। কারণ এর ফলে যারা সৃজনশীল কাজ করে তারা তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। এমনকি এর জন্য যদি তাদের কোনো আর্থিক লাভ হওয়ার কথা সেটাও হয় না। আমরা একটি গল্পের বইয়ের উদাহরণ থেকে এই ব্যাপারটি আরো একটু ভালো করে বুঝতে পারব। একজন লেখক তার শ্রম, সময় এবং চিন্তা দিয়ে বইটি লিখেন। এরপর একজন প্রকাশক বইটি প্রকাশ করেন। তিনি বাজার থেকে কাগজ কিনে, বইটি ছাপিয়ে, বাঁধাই করে, বিভিন্ন বিক্রেতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। স্বভাবতই এ কাজে তার যে খরচ হয় সেটি ধরে নিয়ে তিনি বইয়ের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি অংশ লেখক পান যাকে বলা হয় রয়্যালটি। এখন যদি কেউ লেখকের অজান্তে তার বই বের করে ফেলে তাহলে লেখক তার এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যেটি সৃজনশীল কর্মের যারা স্রষ্টা তাদের এই অধিকার অক্ষুণ্ণ বা বজায় রাখে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপি বা পুনরুৎপাদন, অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইনের বিধান রাখা হয়। যেহেতু এই আইন কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি তাই এটিকে কপিরাইট (Copyright) আইন বা সংক্ষিপ্ত কপিরাইট বলে।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর বই কপি করা বা নকল করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে। লেখকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ১৬৬২ সালে কপিরাইট আইন (Licensing of the Press Act ১৬৬২) পার্লামেন্টে পাস করে। এই আইনের আওতায় যারা তাদের বইয়ের অননুমোদিত কপি করা বন্ধ করতে চায় তারা তাদের বই রেজিস্ট্রেশন করে একটা লাইসেন্স নিত। বই দিয়ে সূচনা হলেও পরে দেখা যায় সৃজনশীল কর্মের অন্যান্য প্রকাশেরও সংরক্ষণ প্রয়োজন। তখন বিভিন্ন আবিষ্কার, ব্যবসার মার্কা ইত্যাদিও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ বা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের আওতায় চলে আসে। কম্পিউটার আবিষ্কারের পর দেখা গেল বই, ছবি বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন খুবই সহজ। আর ইন্টারনেটের আবিষ্কারের পর দেখা গেল তা সারা দুনিয়াতেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কাজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদন এবং বিতরণও এখন এই আইনের আওতায় চলে এসেছে। একই সঙ্গে কম্পিউটারের প্রোগ্রামও যেহেতু একটি সৃজনশীল

কর্মকাণ্ড, তাই এই আইনের আওতায় এর স্রষ্টা তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন। বর্তমানে যেসব দেশে এই আইন আছে সেসব দেশে সৃজনশীল কাজের কপিরাইট স্রষ্টার মৃত্যুর পরও বলবৎ থাকে। এটি কোনো কোনো দেশে এমনকি ১০০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত এটি লেখক, শিল্পী, নাট্যকারের মৃত্যুর পর ৫০ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। বাংলাদেশের কপিরাইট আইনে (কপিরাইট আইন ২০০০) এর মেয়াদ ৬০ বছর। যখন কোন সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট ভঙ্গা করে সেটি পুনরুৎপাদন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় চোরাই (Pirated) কপি। যেহেতু কম্পিউটারের বিষয়গুলো সহজে কপি করা যায় তাই এগুলোর চোরাই কপি পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় আমাদের এই বিষয়টি সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু কম্পিউটার থেকে কপি করে দেব তখন যেন কপিরাইট আইন ভঙ্গা না করি। শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা গেমস নয়, আমাদের কম্পিউটারে অনেক সময় অনেক ছবি থাকে, অনেকের গল্প-কবিতাও থাকে। আমরা যখন কাউকে সেটা কপি করে দেব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সেগুলো কপি করে অন্যকে দেওয়ার অধিকার নেই। তবে সৃজনশীল কর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতাও থাকে। বিশেষ করে, একাডেমিক বা পড়ালেখার কাজে সৃজনশীল কাজ কপি করা যায়। পড়ালেখার কাজে আমরা কোনো বইয়ের যে ফটোকপি করি, তা কপিরাইট আইন ভঙ্গা করে না। এরকম ব্যবহারকে বলা হয় ‘ফেয়ার ইউজ’।

কপিরাইটের এই সংরক্ষণবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি ভিন্নধর্মী ধারণাও বর্তমানে বেশ চালু হয়েছে। এর মূল কথা হলো কোনো লেখক, শিল্পী, প্রোগ্রামার বা নাট্যকার ইচ্ছে করলে তার সৃষ্ট সৃজনশীল কর্মকে শর্তসাপেক্ষে কপি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। এই দর্শনকে বলা হয় মুক্ত দর্শন বা ওপেন সোর্স ফিলসফি (Open Source philosophy)। যারা এই দর্শনের অনুসারী তারা তাদের সৃজনশীল কর্মকে কয়েকটি লাইসেন্সের মাধ্যমে সবাইকে ব্যবহার করতে দেন। এর মধ্যে কপিরাইটের একেবারে উল্টোটি হলো কপিলেফট (Copyleft)। যার অর্থ সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টা সবাইকে এই কাজ কপি করার সানন্দ অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন। কপিরাইট আর কপিলেফটের মাঝখানে রয়েছে সৃজনী সাধারণ বা ক্রিয়েটিভ কমন্স (Creative Commons)। সৃজনী সাধারণ লাইসেন্সের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মস্রষ্টার কিছু কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, যে কেউ ইচ্ছে করলে লেখকের বই তার লিখিত বা কোনো আইনী অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করতে পারবে। তবে লেখকের নামে প্রকাশ করতে হবে বা সেটি দিয়ে কোনো মুনাফা লাভ করা যাবে না। মুক্ত দর্শনের আওতায় যে কম্পিউটার সফটওয়্যারগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলোকে একত্রে মুক্ত সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (Open Source Software) বলা হয়। এই সফটওয়্যারগুলো সহজে একজন অন্যজনকে কপি করে দিতে পারে, ব্যবহারও করতে পারে। তবে যেহেতু সবাই কপি এবং পরিবর্তন করতে পারে তাই সারাবিশ্বের লোকেরা মিলে এই সফটওয়্যারগুলোকে খুবই শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলে। এই দর্শনের আর একটি বড় প্রকাশ হল মুক্ত জ্ঞানভান্ডার উইকিপিডিয়া (www.wikipedia.org)। সবাই মিলে ইন্টারনেটে এই মুক্ত জ্ঞানকোষ গড়ে তুলেছে কয়েকটি মুক্ত লাইসেন্সের আওতায়।

দলগত কাজ

মুক্ত দর্শনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল তৈরি করে শিক্ষকের সহয়তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখলাম : কপিরাইট, কপিলেফট, ক্রিয়েটিভ কমন্স, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, Pirated, ফেয়ার ইউজ, মুক্ত দর্শন।

পাঠ ২৪-২৬: নৈতিকতা ও প্রোজারিজম

আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে যে দোকানগুলো আছে সেগুলো বাইরে থেকে দেখি, প্রত্যেকটা দোকানের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি না দরজাটা খোলা আছে কী না। যদি দরজাটা খোলা থাকে আমরা অপরিচিত একজন মানুষের ঘরে ঢুকে যাই না। কেউ যদি ঢুকেও যায় সে দোকানের ভেতরের সব জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে চলে আসে না। আমরা সত্য মানুষ সে হিসেবে আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব থাকে। বরং যদি কখনো দেখা যায় কেউ তার দরজা ভুলে খুলে চলে গেছে, তাকে ডেকে এনে বলি দরজাটা বন্ধ করে যেতে।

তথ্য প্রযুক্তি আসার পর হুবহু এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটে আমরা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখি, সেখানে যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তার যে অংশটুকু সে আমাদের দেখাতে চাইছে আমরা সেই অংশটুকু দেখতে পাই। ওয়েবসাইটের নিজস্ব বা গোপন অংশটুকুতে আমাদের ঢোকার কথা নয়, প্রয়োজনও নেই। সেখানে যেতে পারে তাদের নির্দিষ্ট মানুষজন— যারা গোপন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট তথ্য সাজিয়ে রাখে, বা কাজ করে। যাদের সেখানে যাবার অনুমতি নেই তারাও কিন্তু সেখানে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। পাসওয়ার্ড জানা না থাকলেও সেটাকে পাশ কাটিয়ে অনেক সময় কেউ ওয়েবসাইটের ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে ভেতরে ঢুকে সে কোনো কিছু স্পর্শ না করে বের হয়ে আসতে পারে— আবার কোনো কিছু পরিবর্তন করে বা নষ্ট করেও চলে আসতে পারে। যেহেতু এই কাজগুলো করা হয় নিজের ঘরে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে এবং যেখানে অনুপ্রবেশ হয় যেটা হয়তো লক্ষ মাইল দূরের কোনো জায়গা— অদৃশ্য একটি সাইবার জগৎ, লোকচক্ষুর আড়ালে, তাই সেটা ধরার উপায়ও থাকে না। এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে হ্যাকিং এবং আজকাল নিয়মিতভাবে কম্পিউটারের ওয়েবসাইট হ্যাকিং হচ্ছে। কেউ যদি শুধুমাত্র কৌতূহলী হয়ে অন্যের ওয়েবসাইটে ঢুকে কোনো ক্ষতি না করে বের হয়ে আসে তাকে বলে White hat hacker বা সাদা টুপি হ্যাকার আর যদি কোনো কিছু ক্ষতি করে আসে, নষ্ট করে বসে তখন তাকে বলে Black hat hacker বা কালো টুপি হ্যাকার। তোমরা শুনবে অবাক হয়ে যাবে সাইবার ওয়ার্ল্ড এরকম অসংখ্য সাদা টুপি আর কালো টুপি হ্যাকার প্রতিমুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ওয়েবসাইটগুলোতে বেআইনীভাবে ঢোকা ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে— নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তেই আগের থেকে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তারপরও হ্যাকাররা বসে নেই। ১৯৮৩ সালে মাত্র ১৯ বছরের একটা ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের নিরাপত্তা ভেদ করে তাদের ওয়েবসাইট হ্যাক করে ঢুকে গিয়েছিল।

বুঝতেই পারছ হ্যাকিং অনৈতিক কাজ। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করতে বা বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সবারই ইচ্ছে করে কিন্তু ওয়েবসাইটের হ্যাক করা সেরকম চ্যালেঞ্জ নয়! অনৈতিক চ্যালেঞ্জ নেয়ার কোনো কৃতিত্ব নেই। যাদের বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ নেবার ইচ্ছে করে তাদের জন্যে শত শত সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলোই নিতে পারে।

যখন পিইসি, জেএসসি, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় তখন ওয়েবসাইটে সেটা দিয়ে দেয়া হয়। তোমাদের অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছ প্রথম যখন সেটা প্রকাশিত হয়, আর সবাই একসাথে যখন সেটা দেখার চেষ্টা করে তখন অনেক সময়ই দেখা যায় ওয়েবসাইটটি কাজ করছে না। কেউ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না— সবকিছুর একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে, কাজেই ধারণ ক্ষমতার বেশি হয়ে গেলে ওয়েবসাইট আর সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বাভাবিক

কারণেই সেটা হতে পারে। আবার অনেক সময় কেউ ইচ্ছে করে সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলতে পারে যেখানে একটা কম্পিউটারের একটা প্রোগ্রাম কৃত্রিমভাবে কোনো একটা ওয়েবসাইটে প্রতি সেকেন্ডে শত সহস্রবার প্রবেশ করতে পারে— তখন তার থাকায় ওয়েবসাইটটি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই এটাও অনৈতিক কাজ, ইচ্ছে করে একটা ওয়েবসাইট অচল করে দেয়ার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই।

আজকাল অনেক পত্রপত্রিকাও ওয়েবসাইটে দেয়া হয়। অনেক পত্রপত্রিকাতেই একটা খবর বা কোনো একটা লেখার পিছনে পাঠকরা নিজেদের মন্তব্য লিখতে পারে। পাঠক ইচ্ছে করলেই অনেক সৃষ্টিভিত্তিকভাবে একটা বাঁটা মন্তব্য লিখতে পারে— কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় একজন পাঠক শূণ্য শূণ্য যুক্তিহীন, অশালীন একটা কথা লিখে রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু করার নেই—কিন্তু সবাইকে জানতে হবে বিষয়টা অনৈতিক।



আজকাল দেশ ও পৃথিবীর ধার সব ভরস্বপূর্ণ পত্রিকা ইন্টারনেটে থাকে। অনেক অরিগনাল পাঠকরা সরাসরি মন্তব্য লিখতে পারে।

ইন্টারনেটে বেছেছু মানুষের নিজের মত প্রকাশের বিশাল স্বাধীনতা রয়েছে— যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটা প্রকাশ করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে সেটাকে অপব্যবহার করা হয়। ই-মেইলে অনেক সময় কার্ডকে আঘাত দিয়ে কিংবা ছুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেয়া হয়। লুকিয়ে করা হয় বলে সেটা নিয়ে অনেক সময় কিছু করাও যায় না। কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একজনকে অসম্মান করার জন্যে তার সম্পর্কে মিথ্যা কিংবা অসম্মানজনক কোনো তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য মানুষের কাছে তথ্য পাঠানোর যে কাজটি আগে কঠিন ছিল এখন সেটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাজেই সেই কাজটি ভালোভাবে ব্যবহার না করে যখনই খারাপভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই বুঝতে হবে নৈতিকতা রক্ষা করা হয় নি।

দলপত্ন কাজ

হ্যাকিং করে কোনো একটি ওয়েবসাইট নষ্ট করে দিলে সেই ক্ষতিটুকু কোথা থেকে ঢুক করে কোথায় পর্যন্ত বেতে পারে সেটি বের কর। তোমার বক্তব্যের পেছনে যুক্তি দেওয়ার জন্যে সম্ভাব্য হ্যাকিংয়ের একটা উদাহরণ দাও।

কখনো কখনো ইন্টারনেট বা তথ্য প্রযুক্তিতে শূণ্য যে অনৈতিক কাজ করা হয় তা কিন্তু নয়— সীমা অতিক্রম করে কেবাইনি কাজও করার চেষ্টা করা হয়। ওয়েবসাইট হ্যাকিং করা শূণ্য যে অনৈতিক কাজ তা নয়, সেটা একই সাথে কেবাইনি কাজ।

ইন্টারনেটে এরকম অনেক ধরনের মানুষ অনেক ধরনের অনৈতিক আদর কেবাইনি কাজ করে ফেলে।

আমাদের সেগুলো জানা থাকে ভালো। বেহেতু পুরো বিষয়টা হয় সাইবার অপডে, চোখের আড়ালে তাই প্রতারণার কাজটি হয় সবচেয়ে বেশি। যেমন হয়তো কারো সাথে যোগাযোগ করে বলা হল যে সে লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছে। টাকাটা নিতে হলে অমুক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে। সরল বিশ্বাসে হয়তো সেই মানুষটি যোগাযোগ করে। তখন তাকে বোঝানো হয় কিছু টাকা দিলে বড় পুরস্কারটা পেয়ে যাবে। অনেক সময় মানুষটি – সেই টাকা দিয়ে প্রতারণার কীদে পড়ে যায়। আবার কেউ হয়তো জানায় যে, তার হাতে অনেক টাকা চলে এসেছে এবং সে টাকাটা নিরাপদে রাখতে চায় – তখন অনেকে শোভে পড়ে সেই কীদে পা দেয়। কাজেই সবার জানা থাকে ভালো অগরিচিত ই-মেইলের এরকম অবিশ্বাস্য লোভনীয় আশ্বাস নিঃসঙ্গমহে প্রতারণা।

ইন্টারনেটের বড় একটি অপরাধ হয় ক্রেডিট কার্ড নিয়ে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জেনে গেছ আজকাল কাপড়ের নোট দিয়ে টাকা পরসার সেনসেন খুব দ্রুত কমে আসছে। পৃথিবীর অনেকেই সেটি করে ক্রেডিট



অনেক অসামর্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা এ রকম ই-মেইল পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার চেষ্টা করে।

পূর্বসূ সেমা হয় – সেখান থেকে নম্বরটি বের করা কঠিন। কিন্তু প্রতারণা মানুষকে প্রতারণা করে যৌকা দিয়ে নম্বরটি জেনে সেবার চেষ্টা করে এবং মানুষটি বোঝার আগে সেই নম্বরটি ব্যবহার করে বড় অর্থের টাকা ছুঁলে নেয়।

আজকাল অপরাধীরাও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। তারা তাদের অবৈধ কাজের জন্য ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে পাচার করে। সারা পৃথিবীতেই সে জন্যে আইন পাস করা হচ্ছে। যাদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যায় না তাদেরকে এই বিশেষ আইন দিয়ে বিচার করতে হয়।

পৃথিবীতে অনেক কিস্তি মানুষ থাকে যারা স্কুল বিদ্যালয় নিয়ে বেঁচে থাকে। সাম্প্রদায়িক, জাতি এরকম অসংখ্য মানুষ বা দল আছে। তারা তাদের বিদ্যালয়কে ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করে – হিসাব বিবেচনা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এমনও দেখা গেছে যে একটি সংগঠন হত্যা মানুষকে আরো হত্যা করিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কার্ড দিয়ে। ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হলে সেই কার্ডটিরও প্রয়োজন হয় না-শুধু নম্বরটি জানলেই চলে। কাজেই মানুষের ক্রেডিট কার্ডের নম্বর জানার জন্য বড় বড় অপরাধীরা অনেক বড় বড় সাইবার অপরাধ করে। সাধারণত যখন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হয় তখন নিরাপত্তার বিষয়টিতে অনেক

তবে তোমাদের এসব নিয়ে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের জানতে হবে তথ্য প্রযুক্তি, ইন্টারনেট কিংবা সাইবার জগৎ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এটাকে সুলভভাবে ব্যবহার করে কিছু মানুষ হঠাৎ বড় ধরনের অন্যান্য অপরাধ করে ফেলাতে পারে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা যদি একটুখানি সতর্ক থাকি তাহলেই এই অপরাধী মানুষের পেতে রাখা ঝাঁদে আমরা কখনোই পা দেব না। আমরা শুধুমাত্র সুন্দর আর আমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ব্যবহার করতে পারব।

কম্পিউটার ভাইরাসের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। অনেকে মজা করার জন্যে হোক বা অপরাধ করার জন্যেই হোক, নানা ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করে সেটাকে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়। সেগুলো ইন্টারনেটের ভেতর দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতরে কম্পিউটারে ঢুকে পড়ে। ছোটখাটো যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সেগুলো অনেক বড় বড় সমস্যা ঘটাতে পারে। Mydoom Worm নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে একদিনে আড়াই লক্ষ কম্পিউটারকে আক্রান্ত করেছিল। ১৯৯৯ সালে Melissa নামে একটা কম্পিউটার ভাইরাস এত শক্তিশালীভাবে সাইবার জগৎকে আক্রমণ করেছিল যে, মাইক্রোসফটের মতো বড় কোম্পানিকে তাদের ই-মেইল সার্ভারকে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



মেগিলা ভাইরাস তৈরি করার অপরাধে অভিযুক্ত মিলি নামে এই মানুষটির দশ বছর জেল হয়েছিল।

দলগত কাজ

কম্পিউটারে বেআইনী কাজ করে বিপদে পড়েছে এর উপর ভিত্তি করে একটা কার্টুন আঁক।

প্রেক্ষারিচয় :

নিজের লেখার অন্যান্য লেখা কোনো কিছু ব্যবহার করতে হলে সবসময় সেটি পরিষ্কার করে বলে অন্যের অবদান স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. যার অন্তর্নিহিত মৌল সূত্র এক সুনির্দিষ্ট শিল্পাদর্শ ও শিল্পতাত্ত্বিক পটভূমির উপর স্থাপিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমসঙ্করমান নাট্যবৃত্ত ও তাত্ত্বিকবোধে আমরা লক্ষ করি তাঁর স্বদেশ ও শিল্পভাবনার পরিপত্তিশীল এক অভিব্যক্তি।
২. ড. আহমেদ আমীনুল ইসলাম, স্বদেশ ও শিল্পতত্ত্বের পটভূমিকায় নাট্যকার সেলিম আল দীন, শিয়েটার স্টাডিজ, সেলিম আল দীন সংখ্যা, জুন ২০০৮, সংখ্যা-১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাতার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬১।
৩. সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন কর্তৃক রচিত ঢাকা নাটকের প্রজন্মভূমিকা।
৪. ড. আফসার আহমদ, সেলিম আল দীনের শিল্পতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষা, শিয়েটার স্টাডিজ, প্রাপ্তক, পৃষ্ঠা-২৬।
৫. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের উপকথা, রূপকথা, ধর্ম ও সচেতুড়ি সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য জাগে... ১৯৮৬ সালে ঢাকা শিয়েটার আয়োজিত 'জাতীয় নাট্যমেলা'য় আমরা এদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সাধনের সংকল্প উচ্চারণ করি।

আমরা যখন লেখাপড়া করি তখন আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখি বা আশে আনতাম না- তার সাথে সাথে আমরা আরো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ হওয়া, খাটি মানুষ হওয়া। খাটি মানুষেরা অন্যায় করে না, অন্যায় সহ্যও করে না। নিজেরা অন্যায় করে না, অন্যদেরকেও অন্যায় করতে দেয় না। আমরা সবসময় স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা যখন লেখাপড়া করবে তখন অন্য অনেক নতুন জিনিস শেখার সাথে সাথে সত্যিকারের মানুষ হওয়াটাও শিখবে।

তারপরও আমরা মাঝে মাঝে দেখি ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার সময় দেখাদেখি করে। তোমরা কখনো কখনো দেখে থাকবে বড় কোনো পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্রছাত্রী স্কল করতে গিয়ে ধরা পড়ছে, তাদের পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে- এই ছাত্রছাত্রীরা নির্ভীকতা করে নিজেরদের ভবিষ্যট্টাকেই নষ্ট করে ফেলেছে।

এরকম ব্যাপার পৃথিবীর সব জায়গাতেই দেখা যায়- তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই বিষয়গুলো হঠাৎ করে নতুন একটা মাত্রা পেয়েছে। লেখাপড়া করতে গেলেই হোমওয়ার্ক করতে হয়। হোমওয়ার্কগুলো সবসময়েই নিজে করতে হয়। অন্য কেউ হোমওয়ার্ক করে দিলে হয়তো ভালো নম্বর পাওয়া যায় কিন্তু শেখা তো হয় না। হোমওয়ার্ক নানা ধরনের হতে পারে- ছাত্রছাত্রীরা বতাই বড় ক্লাসে যায় ততই তাদেরকে আরো বড় বড় হোমওয়ার্ক করতে হয়। বড় রচনা লিখতে হয়, বড় প্রজেক্ট লিখতে হয়। তারা সত্যিকারের ছাত্র তারা নিজেরা পড়াশোনা করে খাটাখাটুনি করে গবেষণা করে সুন্দর সুন্দর রচনা লিখে। অনেক সময়েরই কোনো কোনো শিক্ষার্থী সেই পরিচয় করতে সক্ষম হয় না। বেহেতু ইন্টারনেটে পৃথিবীর প্রায় সব বিষয়েই কিছু না কিছু তথ্য আছে তাই তারা সেখান থেকে ছব্বছ বিবরণ নিয়ে নিজের নামে জমা দিয়ে দেয়। এটি খুব বড় ধরনের অনৈতিক কাজ, এটাকে কলে প্রোজারিজম।



প্রোজারিজমের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক ব্যক্তি সম্পন্ন সাংবাদিক ফরিন জাকারিয়াকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

তোমরা সতর্কত পদটা আশে পাশে নি, সত্যিকার কলতে কী তোমরা যদি বড়দেরকে জিজ্ঞেস কর দেখবে তাদের অনেকেরই এটা হয়তো আশে পাশে শোনেন নি। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই শব্দটার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ এটা পৃথিবীতে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবে হোক না সুবে হোক অনেকেরই প্রোজারিজম করছে- এবং তাদের অনেকেরই এজন্য খুব বড় বিপদে পড়ে যায়।

আমরা অবশ্যই অন্যের লেখা পড়ে শিখ এক নিছেরা কিছু লেখার সময় অন্যের লেখার সাহায্য নেওয়াটাও অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিলে নিজের লেখার সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বসে দিতে হয়। কোন অংশটুকু তুমি নিজে লিখেছ আর কোন অংশটা অন্যের লেখা থেকে নিয়েছ সেগুলো যদি খুব স্পষ্ট থাকে তাহলেই কোন সমস্যা হয় না।

তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রোজারিজম যেমন বেড়েছে ঠিক সেরকম প্রোজারিজম ধরার কৌশলও অনেক বেড়েছে। তোমরা কী জান কোনো মানুষ যদি ইন্টারনেটের কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু হুবহু টুকে নেয় সেটা কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাথে সাথে খুঁজে বের করা যায়।

অন্যায় করলে সেটা নিজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে- কিন্তু নিজের জন্যে বিপজ্জনক সে জন্যে নয়, তোমরা কখনোই কোনো অন্যায় করবে না। কারণ তোমরা বাংলাদেশের একেবারে খাটি মানুষ হয়ে বড় হবে এবং বড় হয়ে তোমরাই একদিন এই দেশের দায়িত্ব নেবে।

দক্ষত কর্তব্য : রিপোর্টের সবাই দুটি মাসে তাপ হয়ে প্রোজারিজম আর নিজের তৈরি করা কাজের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন কর।



নতুন শিখান: হ্যাকিং, কালো টুপি হ্যাকার, সাদা টুপি হ্যাকার, ক্রেডিট কার্ড, Mydoom Worm, Melissa, প্রোজারিজম।

নমুনা প্রশ্ন

১. বাড়িতে কম্পিউটার রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থান কোনটি?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. বসার ঘর | খ. শোওয়ার ঘর |
| গ. খাবার ঘর | ঘ. পড়ার ঘর |

২. সামাজিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে-

- ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ নাও হতে পারে
- আন্তরিকতার অভাব থাকে
- প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. কম্পিউটারে আসক্ত একজন ব্যক্তি -

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ক. অসামাজিক হয়ে যেতে পারে | খ. কম্পিউটারে দক্ষ হতে পারে |
| গ. লেখাপড়ায় ভাল হতে পারে | ঘ. জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি করতে পারে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিমুর বয়স পাঁচ। ইদানিং ঘুম থেকে উঠেই সে টেলিভিশনে কার্টুন দেখতে শুরু করে। এ সময় সে বাবা-মাকে বিরক্ত করে না বলে বাবা-মাও বেশ খুশি।

৪. রিমুর ক্ষেত্রে কার্টুন দেখাকে বলা যায় -

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ক. সময় কাটানো | খ. প্রয়োজন মেটানো |
| গ. কার্টুনের প্রতি আসক্তি | ঘ. আনন্দ উপভোগ করা |

৫. রিমুর প্রতি বাবা-মার আচরণে সে -

- অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে
- শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে
- সৃজনশীল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ার্ড প্রসেসিং



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

১. সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করে ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. বাংলা কী-বোর্ড ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
৩. ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারব;
৪. ওয়ার্ডে বাংলা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারব;
৫. সুষ্ঠুভাবে ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা করতে পারব।

পাঠ ২৭ থেকে ৫৪: ওয়ার্ড প্রসেসিং ও বাংলা কী-বোর্ডের ব্যবহার

তোমরা ইতোমধ্যেই জানেছ, আমরা এখন লেখালেখি, ছবি আঁকাসহ অনেক কাজই করতে পল্লি কম্পিউটার ব্যবহার করে। ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে তোমরা এর মধ্যেই ইংরেজিতে ডকুমেন্ট টাইপ করতে শিখেছ। এখন এ প্রেক্ষিতে আমরা শিখব ওয়ার্ড প্রসেসিং ব্যবহার করে বাংলা ডকুমেন্ট তৈরি করার কলাকৌশল।



মুদ্রিত ইন্টারনেট কী-বোর্ড লেআউট

বাংলা কী-বোর্ড: ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে কোনো কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন একটি কী-বোর্ডের। কী-বোর্ড হলো ওয়ার্ড প্রসেসরের প্রধান ইনপুট ডিভাইস। ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে বাংলায় লেখালেখি করতে হলে আমাদের বাংলা কী-বোর্ড সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। ইংরেজি কী-বোর্ডের উপর তিস্তি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শহীদ মুন্সীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত কী-বোর্ড সে-আউট তৈরি করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-বিরোধী চাল বন্দর বাহিনী মুদ্রিত চৌধুরীকে হত্যা করেছিল।

পরবর্তী সময়ে এ কী-বোর্ড সে-আউটই কম্পিউটারের জন্য করা হয়। কিছু প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের বা কম্পিউটারে বাংলা লিখতে সহায়তা করবে। এ পর্বে ১৯৮৫ সালে কিছু বাংলা কম্পিউটার শহীদ শিপি সফটওয়্যারটি প্রবর্তিত হয়। কিছু এটি তেমন একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে নব্বই দশকের শেষের দিক পর্যন্ত অনেকগুলো বাংলা লেখার সফটওয়্যার বাজারে আসে। যার মধ্যে বিজয়, প্রশিক্ষণ শব্দ, প্রবর্তনা, লেখনী প্রভৃতি প্রথম সারিতে ছিল। সফটওয়্যার উন্নয়নের কারণে একে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার বিষয় সফটওয়্যারটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় বিভিন্ন কী-বোর্ড সে-আউট প্রচলিত হলেও বিজয় কী-বোর্ড সে-আউট সবচেয়ে এগিয়ে থাকে।

⌘ +	! 1	@ 2	# 3	¢ 4	% 5	^ 6	7 7	* 8	(9) 0	- -	+ =	Back Space ←
Tab	Q q	W w	E e	R r	T t	Y y	U u	I i	O o	P p	{ [}]	~ `
Caps Lock	A a	S s	D d	F f	G g	H h	J j	K k	L l	;	'	Return ↵	
Shift	Z z	X x	C c	V v	B b	N n	M m	< ,	> .	? /	Shift		
Ctrl	Alt		Space Bar				Alt	Ctrl					

বিজয় কী-বোর্ড সেআউট

ওয়ার্ড প্রসেসরে বিজয় কী-বোর্ড সচল করতে Ctrl+Alt+B একসাথে চাপতে হবে। বিজয় কী-বোর্ডে যে কোনো দুটি অক্ষরকে যুক্ত করতে হলে প্রথম অক্ষরটি চেপে ইংরেজি জি (g) চাপতে হবে। তারপর দ্বিতীয় অক্ষরটি চাপতে হবে।

বিশেষ যুক্তাকর:

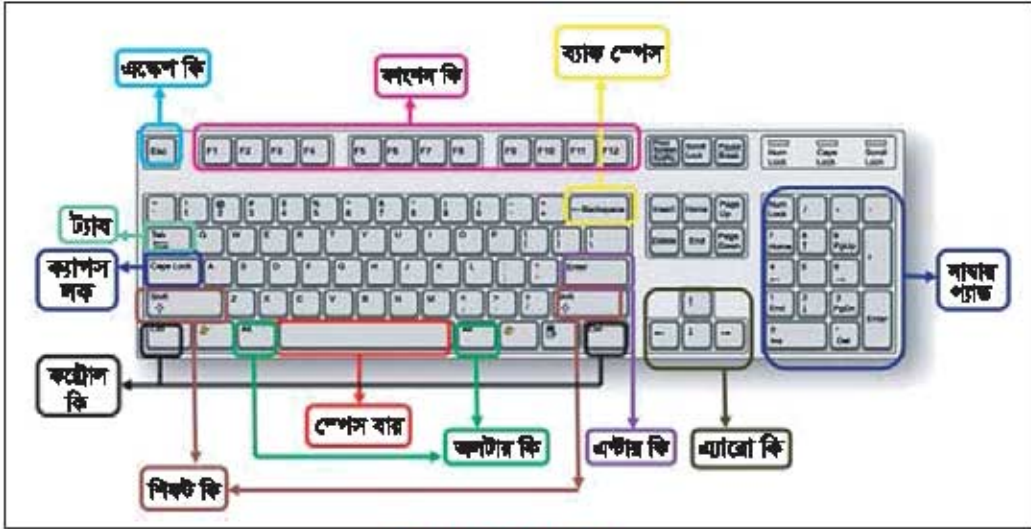
বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী	বর্ণ	কী
ঞ্জ	gN	ঝ	NgB	ঞ	Igy	জ	ugI
ঞ	Igu	জ	IgY	জ	qgo		

যদিও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) ন্যাশনাল কী-বোর্ড নামে একটা বাংলা কী-বোর্ড গে-আউট অনুমোদন করেছে কিন্তু তার ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি। পৃথিবীর অন্য সকল ভাষার মতো বাংলাও ইউনিকোড ব্যবহার

ক k	ট T	প p	স s	অ o	ও ৌ OU	০ 0	নির্দেশনা: ■ কেস সেনসিটিভ ■ কেস সেনসিটিভ নয় (v)- (c)- ~ Accent Key 
খ kh	ঠ Th	ফ ph,f	হ h	আ ী a	ব (ফলা) w	১ 1	
গ g	ড D	ব b	ড় R	ই ি i	J - য ফলা (c)y, Z	২ 2	
ঘ gh	ঢ Dh	ভ bh,v	ঢ় Rh	ঈ ি I	⌋ - র ফলা (c)r	৩ 3	
ঙ Ng	ণ N	ম m	য় y,Y	উ ্ u	⌋ - রেফ (v)rr(c)	৪ 4	
চ c	ত t	য z	ৎ t'	উ ্ U	⌋ - হসত ,,	৫ 5	
ছ ch	থ th	র r	ং ng	খ ্ ri	। - দাড়ি .	৬ 6	
জ j	দ d	ল l	ঃ :	এ ৈ e	৳ - টাকা S	৭ 7	
ঝ jh	ধ dh	শ sh,S	্ ^	ঐ ঠ OI	. - ডট (NumPad)	৮ 8	
ঞ NG	ন n	ষ Sh	জ J	ও ৌ O	: (কোলন)	৯ 9	

উচ্চারণভিত্তিক (ফোনেটিক) কীসমূহ

করে লেখা যায়। কাজেই একজন যে কী-বোর্ড ব্যবহার করেই বাংলা লিখুক না কেন, সেটি সম্বন্ধে সন্দেহ করা হবে



কী-বোর্ডের বিশেষ কী সমূহ

আন্তর্জাতিক নিয়মে সে কারণে একটি নির্দিষ্ট কী-বোর্ডের গুরুত্ব কমে এসেছে। এদিকে ২০০০ সালের পর থেকে বাড়তে থাকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বাংলায় ওয়েব পেইজ তৈরি করার। ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার কারণে প্রয়োজন হয় এমন একটি সফটওয়্যারের বা ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলা লেখার সুবিধা এনে দিবে। ২০০৭ সালে বিনামূল্যের ইউনিকোড সফটওয়্যার অত্র প্রবর্তিত হয়। এটির উচ্চারণভিত্তিক (ফোনোটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থা। এটিকে তখন সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে।

উচ্চারণভিত্তিক (ফোনোটিক) বাংলা টাইপিং ব্যবস্থার যদি "ami banglay gan gai" টাইপ করা হয় তবে লেখা হবে 'আমি বাংলার গান গাই'। এ ছাড়া এতে যুক্ত করা হয় মাউস দিয়ে বাংলা লেখার সুবিধা। কলে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহারে বাসের সীমিত ছিল তারা সহজেই বাংলা ব্যবহার করতে শুরু করে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সফটওয়্যারেই শহীদ মুনির চৌধুরীর উদ্ভাবিত মুনির অপটিমাইজ কী-বোর্ড লে-আউটটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম কীভাবে চালু করতে হয়? মনে আছে?

প্রথমে আমাদেরকে যে কোনো একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। এরপর বাংলায় টাইপ করার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসরকে প্রস্তুত করতে হবে। বাংলায় লেখালেখি করার জন্য প্রথমে আমাদের ওয়ার্ড প্রসেসরে বিজয় সফটওয়্যারে Ctrl+Alt+b একসাথে চাপতে হবে এবং অত্র সফটওয়্যারে F12 কী চাপতে হবে। পরবর্তী কাজ হল ফন্ট নির্বাচন করা। বিজয় সফটওয়্যারে SutonnyMJ এবং অত্র সফটওয়্যারে Nikosh বা যে কোন ইউনিকোড ফন্ট নির্বাচন করতে হবে। এবার আমাদের কম্পিউটারের ওয়ার্ড প্রসেসর

বালা লেখালেখি করার জন্য প্রস্তুত। কী-বোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখে কোথায় কোন অক্ষর আছে। অক্ষরগুলোর অবস্থান জানতে তোমরা উপরে দেখানো কী-বোর্ড লেআউট এর ছবির সাহায্য নিতে পার। এবার শুরু করার পালা লেখালেখি। কী-বোর্ডের বিভিন্ন কী চেপে দেখে কোন অক্ষরটি কোথায় আছে। ধীরে ধীরে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে অক্ষরগুলোর অবস্থান।

যে কোনো ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করার সময় তা খেন হারিয়ে না যায় সে জন্য কী করতে হবে মনে আছে তো? ডকুমেন্টটিকে একটি নাম দিয়ে সংরক্ষণ বা সেভ করতে হবে।

দলগত কাজ

অক্ষরগুলোর অবস্থান সম্পর্কে একটু ধারণা হলে চল আমরা নিচের কাজটি করি :
আমাদের সকলের প্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইনটি টাইপ কর।

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

ডকুমেন্ট সম্পাদনা

আশা করি তোমরা সবাই এখন বাংলায় লেখালেখি করতে পারছ। তুল-ত্রান্তি থাকছে? থাকতেই পারে। কীভাবে আমরা তুল-ত্রান্তিগুলো দূর করব?

যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি ডকুমেন্টের তুল-ত্রান্তিগুলো ঠিক করা হয় সে কাজটিকে বলা হয় সম্পাদনা (Editing)। সম্পাদনার সাধারণত যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

নির্বাচন করা (Select): সম্পাদনার বিভিন্ন কাজে অনেক সময়ই ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন করার জন্য ক্যারসরকে নির্ধারিত জায়গায় সুরতে নিতে হবে। এরপর শিফট কী চেপে ধরে ডান এ্যারো (Shift →) কী চেপে নির্ধারিত কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে নির্বাচন করতে হয়।



কাট (Cut): অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কাটার জন্য কী-বোর্ডের Ctrl এবং x কী একসাথে চাপতে হয়। (Ctrl+x)



কপি (Copy): অনেক সময় ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশের অনুলিপি বা কপি করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয়। এজন্য প্রথমে ঐ অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্বাচন করে কী-বোর্ডের Ctrl এবং c কী একসাথে চাপতে হয়। (Ctrl+c)



পেস্ট (Paste): পেস্ট শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল অর্থা লাগানো। কাট ও কপি করার পরের কাজ হল নির্বাচিত অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা অংশকে নির্ধারিত স্থানে পেস্ট করা। এজন্য কাট বা কপি কমান্ড ব্যবহার করার পর ক্যারসরকে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে Ctrl এবং v কী একসাথে চাপতে হবে। (Ctrl+v)

ভিটিট (Delete) বা মুছে ফেলা: ডকুমেন্টের কোনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোনো অংশকে মুছে ফেলতে হলে কী-বোর্ডের Delete বা Del কী ব্যবহার করা হয়। বা মুছে ফেলতে চাই প্রথমে

তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর Delete বা Del বা BACKSPACE কী চাপলে নির্বাচিত অংশ মুছে যাবে।

কী-বোর্ডের সাহায্যে ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশের ক্রমসরকে সরাসরি হলে নিচের সফিক্ট উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে:

যা করতে চাই	যে কী চাপতে হবে
লাইনের শুরুতে ক্রমসর নিতে	HOME
লাইনের শেষে ক্রমসর নিতে	END
ডকুমেন্টের শুরুতে ক্রমসর নিতে	CTRL+HOME
ডকুমেন্টের শেষে ক্রমসর নিতে	CTRL+END

ডকুমেন্ট করম্যাট করা

ডকুমেন্ট তৈরি করা হলো, সম্পাদনা করা হলো। এখন ডকুমেন্টকে একটু সাজাতে হবে। যাতে করে ডকুমেন্টটি দেখতে সুন্দর হয়। এ কাজটাকে বলে ডকুমেন্ট করম্যাটিং।


আমরা অনেকভাবে ডকুমেন্টকে সাজাতে পারি। আমাদের আলোচনা করেকটি মৌলিক বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ রাখব। কাজ করতে করতে তোমরা হয়ত আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

অক্ষর বা লেখা আকার ছোট বা বড় করা: ডকুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে কোনো ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিবনে কন্ট্রোল নামের পাশে যে সংখ্যাটি থাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। আকার বড় করতে হলে সংখ্যাটি বাড়াতে হবে এবং ছোট করতে হলে সংখ্যাটি কমাতে হবে। কী-বোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখার আকার ১ পয়েন্ট বড় করতে	CTRL+]]
লেখার আকার ১ পয়েন্ট ছোট করতে	CTRL+[[

অক্ষর বা লেখার আকার বেগম, ইটালিক বা আভারলাইন করা: ডকুমেন্টের যে অংশের অক্ষর বা লেখার আকার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হবে। তারপর যে কোন ওয়ার্ড প্রসেসরে টুলবার বা রিবনে ফন্টের নামের পাশে B, I, U থাকে তাতে মাউস ক্লিক করতে হবে। কী-বোর্ডের সাহায্যেও কাজটি সহজে করা যায়।

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
লেখা বেগম করতে	CTRL+b
লেখা ইটালিক করতে	CTRL+i
লেখা আভারলাইন করতে	CTRL+u

ডকুমেন্টের এলাইনমেন্ট: কোন ডকুমেন্টের প্যারাগ্রাফ মার্জিনের কোন দিকে মিলে থাকবে তা এলাইনমেন্টের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট বামদিকে থাকে। প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট চার ধরনের হতে পারে। বামদিক থেকে, ডানদিক থেকে, মাঝ বরাবর অথবা সবদিকে সমান (জাস্টিফাইড) প্যারাগ্রাফ এলাইন করা যায়। কোন প্যারাগ্রাফের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে তা নির্বাচন করতে হয়। তারপর  এই আইকনগুলিতে মাউস ক্লিকের মাধ্যমে এলাইনমেন্ট করা হয়।

কী-বোর্ড শর্টকাট

যা করতে চাই	যে কী ব্যবহার করতে হবে
বাম দিকে এলাইন	CTRL + l
কেন্দ্র দিকে এলাইন	CTRL + r
মাঝখানে এলাইন	CTRL + e
জাস্টিফাইড এলাইন	CTRL + j

এ ছাড়া কন্ট্রোলস্ট্রোকের আরো অনেক কাজ আছে। যেমন, লাইনের ব্যবধান নির্ধারণ (লাইন স্পেস), টেক্সট করা, কুলট ও সান্দ্রার, লেখার হাং পরিবর্তন ইত্যাদি। ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ব্যবহার করতে করতে জোয়ারা এ বিষয়গুলো আয়ত্ত্ব করতে পারবে।


মুদ্রণ

কী বলা! আমরা এখন ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে বাংলায় ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি। কেমন হয় যদি এটা আমরা কাগজে ছাপাতে পারি। চল শিখে নেয়া যাক কীভাবে কোন ডকুমেন্ট ছাপানো যায় বা মুদ্রণ করা যায়।

মুদ্রণের জন্য প্রয়োজন

- কম্পিউটারের সাথে যথাযথভাবে সংকুল একটি প্রিন্টার
- প্রিন্টারের জন্য সরকারি সফটওয়্যার
- উপকূল শাইলের কাগজ



সব ঠিক আছে? তাহলে শিককের অনুমতি নিয়ে  (Print) আইকনে মাউস ক্লিক কর (এ কাজটি কী-বোর্ডের সাহায্যে CTRL + p চেষ্টা করতে পার)। এরপর ↵ (এন্টার) কী চাপলে শুরু হবে মুদ্রণের কাজ।

ডকুমেন্ট ব্যাকআপ

ওয়ার্ড প্রসেসরে বাংলায় ডকুমেন্ট তৈরি করা কত সহজ। এর পরের কাজ কী? ডকুমেন্টটি এমনভাবে সজ্ঞকরণে ব্যাকআপ করা যাতে এটি হারিয়ে না যায় এক ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পওয়া যায়। এ কাজটিকে সহজভাবে ডকুমেন্ট ব্যাকআপনা বলে।

সাধারণভাবে যে কোনো ডকুমেন্ট সজ্ঞকরণ করলে সেটি মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডারে সজ্ঞকিত (Save) হয়। কিন্তু সেখানে অনেকের কাজের মাঝে জোয়ার করা ডকুমেন্টটি বিশেষ থাকবে। প্রয়োজনের সময় ডকুমেন্টটি পওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য যে কাজগুলো করতে হবে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

- ক. মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডার খুলে তার মধ্যে একটি নতুন ফোল্ডার খুলতে হবে।
- খ. প্রাথমিকভাবে ফোল্ডারটির নাম নিউ ফোল্ডার লেখা থাকবে। এটিকে নিজের মতো করে নামকরণ করতে হবে। (নিজের নাম অথবা তারিখ অনুযায়ী ফোল্ডারের নামকরণ করতে পার)।
- গ. জোয়ার তৈরি করা ডকুমেন্টটি সজ্ঞকরণের জন্য কম্পিউটারকে নির্দেশ দিলে যে ছারণ করা আসবে সেখানে জোয়ার ফোল্ডারটি মাউসের ডাবল ক্লিক করার মাধ্যমে খুলে তারপর সজ্ঞকরণ কর।
- ঘ. ডকুমেন্ট সজ্ঞকরণের সময় কাজের ধরন অনুযায়ী ডকুমেন্টের নামকরণ কর। এতে ডকুমেন্টটি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে।

কাজ
ডকুমেন্ট ব্যাকআপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রিন্টে উপস্থাপন কর।



নতুন শিক্কার : কী-বোর্ড লেআউট, ডকুমেন্ট কন্ট্রোলস্ট্রোক, কাট, কপি, পেস্ট, কী-বোর্ড শর্টকাট, ফিটিং বা মুদ্রণ।

নমুনা প্রশ্ন

১. কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ করার সফটওয়্যার কোনটি?

- ক. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার খ. সিস্টেম সফটওয়্যার
গ. ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ঘ. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার

২. উদ্ভাবনগতমিতিক বাংলা সফটওয়্যার কোনটি?

- ক. বিজ্ঞান খ. প্রবর্তন
গ. লেখনী ঘ. অত্র

৩. 'এন্টার' (Enter) কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

- ক. নির্বাচিত অংশ মুছে ফেলাতে খ. কার্সরকে এক লাইন নিচে নামাতে
গ. কার্সরের বাম দিকের অক্ষর মুছেতে ঘ. মেনু বা ডায়ালগ বক্স বাতিল করতে

৪. কোনো কিছু কপি করতে কোথায় ক্লিক করতে হবে?

- ক.  খ.  গ.  ঘ. 

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানুর জনর আমেরিকায়। সে বাংলার কথা বলতে পারলেও লিখতে পারে না। সে ঠিক করেছে সঙ্গে দাদুকে বাংলার লিখে চমৎকার একটি কার্ড পাঠিয়ে চমকে দেবে।

৫. রানু কার্ড বানাতে কোন সফটওয়্যারটি ব্যবহার করবে?

- ক. বিজয় খ. লেখনী গ. প্রশিক্ষা ঘ. অত্র

৬. রানু কার্ডটি সুন্দর ও সহজে তৈরি করতে—

- i. কিছু শব্দ কপি করতে পারে
ii. ছবি সংযুক্ত করতে পারে
iii. এডিটিং করে বানান শুদ্ধ করতে পারে

কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার



এই অধ্যায় শেষে আমরা:

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
২. শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারব;
৩. ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট (পাঠ্য বিষয়ের) তথ্য অনুসন্ধান করতে পারব।

পাঠ ৫৫: শিকায় ইন্টারনেট

ঘটনা ১: যারিন তার বাংলা বইটি হারিয়ে কেলেহে- তার সেটি মোটেও হারানোর ইচ্ছে ছিল না- কিন্তু সেটি সত্যি হারিয়ে গেছে। স্কুল লাইব্রেরি থেকে তার শ্রিয় গল্পের বইগুলো আনার সময় হাতে অনেকগুলো বই হয়ে গিয়েছিল তখন, কোনো এক কঁাকে বাংলা বইটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে, সে টেরও পায়নি। বাসায় এলে তার ভগ্নী মন খারাপ- সুন্দর বাংলা বইটা তার খুব শ্রিয় বই ছিল। শুবু তাই নয় করেকদিন পর পরীক্ষা, সে বই ছাড়া কেমন করে পড়বে?

এই বিশম থেকে তাকে রক্ষা করলেন তার বাবা- তিনি জানেন NCTB (National Curriculum and Textbook Board) এর ওয়েবসাইটে সব পাঠ্যপুস্তক রেখে দেয়া আছে, যে কেউ সেখান থেকে বই ডাউনলোড করে নিতে পারে। শুবু তাই নয়, স্ক্রিনে প্রিন্ট করে সেটাকে বাধিয়ে নিলে সেটা পুরোপুরি সত্যিকারের পাঠ্যপুস্তকের মতো হয়ে যায়। তাই করেক দর্চার মধ্যে যারিন তার শ্রিয় বাংলা বইটি পেয়ে গেল।



NCTB এর ওয়েবসাইট (www.nctb.gov.bd) থেকে যে কোনো পাঠ্যবই ডাউনলোড করা যায়।

ঘটনা ২: আকাশ তার বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছে গুল্টো নাকি আর গ্রহ নয়, শুনে সে বেশ অবাক হল। সেই ছোটবেলা থেকে সে শুনে এসেছে গুল্টো সৌরজগতের একটা গ্রহ- হঠাৎ করে সেটাকে গ্রহের ভঙ্গিমা থেকে কেন সরিয়ে দেয়া হল কে জানে? সে তার বাসায় বড় ভাইকে, বাবা-মাকে জিজ্ঞাস করল, কেউ ঠিক করে কলতে পারল না। স্কুলে স্যারকে জিজ্ঞাস করলেও সে ঠিক উত্তরটি জানতে পারল না- ঠিক তখন তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়ল। সে ইন্টারনেটে গুল্টো গ্রহ নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই উত্তরটি ছেনে গেল- ভাগিনে তার ইন্টারনেটের কথা মনে পড়েছিল।

ঘটনা ৩: শ্রিয়াকো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করছে, কিন্তু হঠাৎ সে একটা জায়গায় আটকে গিয়েছে, একটা বিশেষ ফাংশন সে কিছুতেই ঠিক করে ব্যবহার করতে পারছে না। তাকে একটা বড় হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে- এই বিশেষ ফাংশনটি কেমন করে ব্যবহার করা হয়, না জানলে সে তার হোমওয়ার্কটি জমা দিতে পারবে না। ইন্টারনেটে সে এটা সম্পর্কে অনেক বুঝেছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি।

প্রিয়াকে হতাশ হল না, কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ কোরসে সে এই প্রশ্নটা করে রাখল। এক ঘণ্টার ভেতরে সে আবিষ্কার করল গীচজন প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে রেখেছে— একজনের উত্তরটা ছব্বছ তার প্রশ্নের উত্তর। প্রিয়াকার আনন্দ দেখে কে— এবারে নতুন উৎসাহ নিয়ে তার কাজ শুরু করে দেয়।

ঘটনা ৪: রতন ইংরেজি পরীক্ষা দেবে— সে বেশ অনেকদিন থেকে ইংরেজি পড়ে আসছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না তার পড়াশোনা যথেষ্ট হয়েছে নাকি আরো দরকার। কী করবে সেটা নিয়ে তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। বন্ধু কল, “তুই এখন লাইনে একবার পরীক্ষা দিয়ে দেখিস না কেন কেমন শিখেছিলি?” রতন জিজ্ঞেস করল, “অনলাইনে পরীক্ষা দেয়া যায়?” বন্ধু কল, “অবশ্যই!”

রতন ইন্টারনেটে ঢুকে অনলাইন পরীক্ষার একটা ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখল সত্যি সেখানে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে— খুব উৎসাহ নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সে আবিষ্কার করল তার প্রস্তুতি বেশ ভালো। অনলাইন পরীক্ষার বাড়তি সুবিধেটাও সে আবিষ্কার করল— যে প্রশ্নগুলোর ছল উত্তর দিয়েছে সেগুলোর শূন্য উত্তর কী হবে সেটাও সে জেনে নিল।

ঘটনা ৫: শূরী ইউনিভার্সিটিতে কাইবার অর্গানিজ পড়ায়। তার বেহেতু বয়স কম তাই তার অভিজ্ঞতাও কম— সবসময় মনে মনে ভাবে আমার যদি কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে পরিচয় থাকত তাহলে তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারতাম কেমন করে এই কোর্সটা আরো ভালো করে পড়ানো যায়।

একদিন ইন্টারনেটে একটা খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে খোঁজাখুঁজি করতে করতে সে আবিষ্কার করল তার বিষয় কাইবার অর্গানিজের পুরো কোর্সের লেকচার নোট সেখানে রয়েছে— একজন অনেক বড় প্রফেসর কোর্সটি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন।

শূরী সাথে সাথে কোর্সগুলো ডাউনলোড করে তার নিজের লেকচারটা নতুন করে সাজিয়ে নিল, পরদিন সে ক্লাস নিতে গেল অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

ঘটনা ৬: রাজীব পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গাশ করেছে কিন্তু তার খুব দুঃখ তার বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্ট্রোফিজিক্সের উপর কোনো কোর্স ছিল না— তার খুব শখ এই বিষয়টা পড়ার। হঠাৎ করে খবর গেল খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বড় প্রফেসর এস্ট্রোফিজিক্সের উপর অনলাইনে একটা কোর্স দিচ্ছেন। তার হাত হয়ে সে অনলাইনে পুরো কোর্সটি নিতে পারবে— হোমওয়ার্ক জমা দিতে পারবে, এমনকী পরীক্ষাও দিতে পারবে।

রাজীবের আনন্দ দেখে কে— তখন তখনই সেই কোর্সটিতে রেজিস্ট্রেশন করে মনের আনন্দে এস্ট্রোফিজিক্স পড়তে শুরু করে।

উপরের ৬টি ঘটনার প্রত্যেকটি সত্যি। শিক্ষায় সত্যি ইন্টারনেটের ব্যবহার করা যায় কিনা সেটা নিয়ে কারো মনে এখনো সন্দেহ আছে?

দলগত কাজ

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর যদি একটি করে ল্যাপটপ থাকতো তখন শিক্ষার ব্যাপারে আর কী কী করা যেতে পারে সেটি নিয়ে সবাই মিলে একটি রচনা লিখ।

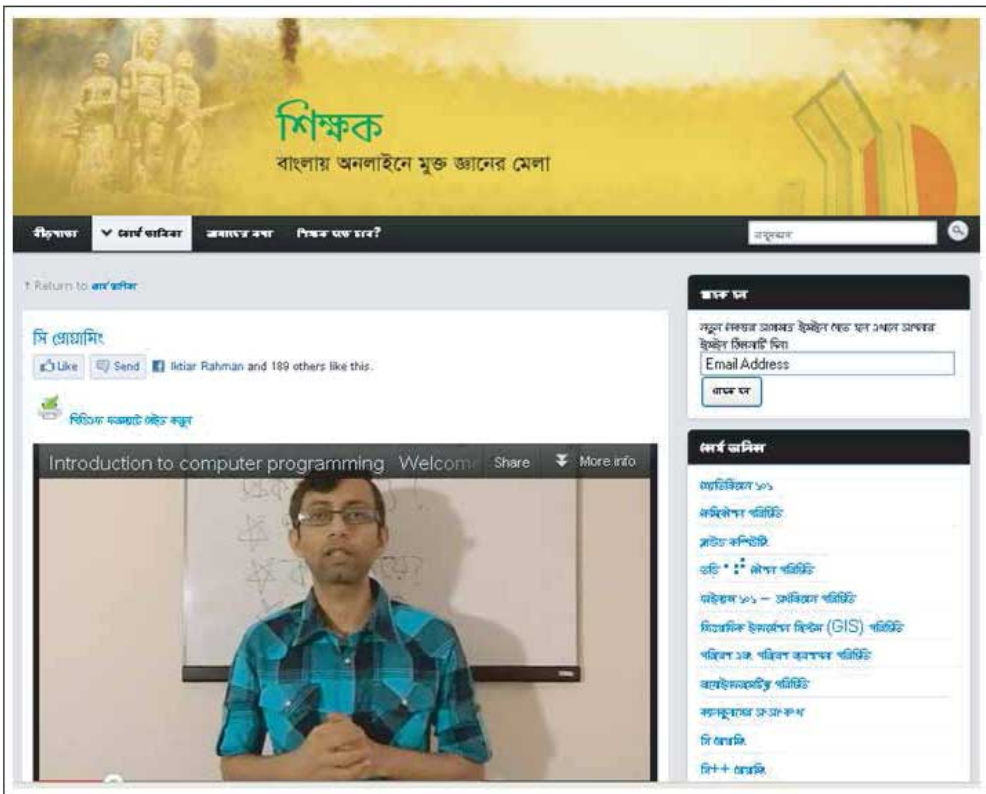


নতুন শিক্ষায়: এস্ট্রোফিজিক্স, কাইবার অর্গানিজ, পুটো।

পাঠ ৫৬: শিক্ষায় ইন্টারনেট

তোমরা যারা আগের পাঠটি মন দিয়ে পড়েছ তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ শিক্ষায় যেসব বিষয় সবচেয়ে সাহায্য করতে পারে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট শুধু যে সরাসরি শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে তা নয়— স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ঠিকমত কাজ করতে পারে সেখানেও পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাজে সাহায্য করে।

যেমন তোমরা সবাই জান পরীক্ষার ফলাফলগুলো আজকাল তোমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে



শিক্ষক ডট কম ওয়েবসাইটে অনেক শিক্ষকেরা নানা বিষয়ে কোর্স পড়িয়ে থাকেন।

জানতে পার। কিছুদিন আগেও যেটি ছিল অনেক কঠিন। গ্রামে বা প্রত্যন্ত এলাকায় যারা ছিল পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্যে তাদের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে শহরে আসতে হতো— আজকাল মোবাইল টেলিফোনের একটি মেসেজ বা ইন্টারনেটে ক্লিকেই পরীক্ষার ফলাফল জেনে যাওয়া যায়।

পরীক্ষার ফলাফল জানার ব্যাপারে ইন্টারনেট ঘেরকম অনেক বড় ভূমিকা রাখে— স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারেও ইন্টারনেট অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। তোমরা মোবাইল টেলিফোন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি রেজিস্ট্রেশনের কথা শুনছ— ঠিক সেরকম ইন্টারনেট ব্যবহার করেও লক্ষ লক্ষ

হেলেমেয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্যে রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। আমাদের দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার লক্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেয়- ভোমরা কি জান এই চার লক্ষ পরীক্ষার্থী সবাই ভর্তির জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনকারী প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করা হয়েছিল।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আগে সবাই সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটু তথ্য জানতে চায়। আসে সেই তথ্য জানার জন্যে একজন মানুষকে অনেক দূর থেকে সেখানে আসতে হতো- এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য একজন ঘরে বসে জেনে নিতে পারে।

প্রযুক্তির কারণে ইতোমধ্যে আমরা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধে ব্যবহার করছি- কিছুদিনের ভেতরে আমাদের দেশেই আমরা আরো নানা ধরনের নতুন নতুন সুযোগ পেতে যাবি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি হতে যাচ্ছে যেটি সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক বখান পড়াবেন তখন সেটি শুধুমাত্র তার ক্লাসরুমে আসা অল্প কয়জন ছাত্রছাত্রী তার নামনে বসে সেটি শুনবে না- ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে বসে হরতো সারা দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী সেটা শুনবে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূর থেকে হরতো একটা জটিল অপারেশন নিজের চোখে দেখতে পারবে। দূর পাহাড়ের উপর কোনো একটা টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে একজন শিক্ষার্থী সৌরজগতের কোনো গ্রহ বা দূর গ্যালাক্সির কোনো নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। অনেক আধুনিক একটা ল্যাবরেটরির কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট একটা ছাত্র তার ঘরে বসে করে করতে পারবে। স্কুল শাইব্রেরিতে যে বইটি নেই মূলতের মধ্যে সেই বইটিও একজন শিক্ষার্থী পড়ার জন্যে নিয়ে আসতে পারবে।

সবকিছু দেখে শুনে মনে হয় বখন ইন্টারনেট ছিল না তখন মানুষ কেমন করে সেখাপড়া করত?

সঙ্গত কাজ

আজ থেকে একশ বছর পরে শিক্ষার ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তি কী ভূমিকা রাখতে পারে সেটি কল্পনা করে একটি দেয়াল পত্রিকা বের কর।



নতুন শিক্ষাম : ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, টেলিস্কোপ, গ্যালাক্সি।

পাঠ ৫৭-৭০: ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান

ইন্টারনেটে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

ইন্টারনেটে তথ্যের এক বিশাল ভান্ডার। দুনিয়ার এমন কোনো বিষয় নেই বা সম্পর্কে ইন্টারনেটে কোনো তথ্য নেই। শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রায় সব বিষয়েই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে রয়েছে নানান তথ্য। শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার ধরন এবং শিক্ষারূপের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ইন্টারনেটে খুবলে পাওয়া যায়।

ইন্টারনেটে এ সকল তথ্য সাধারণত কয়েকভাবে থাকতে পারে। একটি হলো লিখিত তথ্য। অর্থাৎ বিষয়টি সম্পর্কে লিখিত তথ্য। এই ধরনের তথ্যেরও রকমকমের থাকে। কোনোটি হয় সরাসরি তথ্য। যেমন নির্ভটনের গতির সূত্রাবলী। আবার অনেকক্ষেত্রে থাকে এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ। আবার ইন্টারনেটে ইন্দোনীং অনেক বিষয়কসমূহ ভিডিও আকারে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কোনো একটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, সেটি ক্যামেরায় ধারণ করা হয় এবং তারপর সেটি ইউটিউবে (www.youtube.com)-এর মতো কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইটে আপলোড করা হয়। সেখান থেকে এই ভিডিওটি সবাই দেখতে পারে। আবার অনেক সাইটে রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন এনিমেশন বা কার্টুন চিত্র। এখানে পাঠ্যসূত্রির বিভিন্ন বিষয় কার্টুন বা এনিমেশনের মাধ্যমে বোঝানো হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের এ সকল সাইটের কোনো কোনোটিতে রয়েছে প্রশ্ন করার সুযোগ, কোমটিতে আছে কুইজের ব্যবস্থা। আবার অনেক সাইটে রয়েছে পরীক্ষারও ব্যবস্থা।

বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক কোর্সও চালু হয়েছে। এই সকল সাইটে কোনো সুনির্দিষ্ট কোর্সে নিকশন করে ক্লাস করা যায় এবং কোর্স শেষে পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইংরেজি ভাষাতে চালু এরকম অনেক সাইট রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল – <https://www.coursera.org/>, alison.com/ ইত্যাদি।

বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্স অফার করে থাকে। <http://ocw.mit.edu/index.htm> এই সাইটে গিয়ে



এই সাইটে ক্লাসের যে কোনো বই খুঁজে বের করে কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নেয়া যায়।

পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে সম্পন্ন করা যায়।

কেবল ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষাতেও এখন ইন্টারনেট শিক্ষা কার্যক্রম বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে স্কুল পর্যায়ের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক আকারে পাওয়া যায়। www.ebook.gov.bd সাইট থেকে তুমি তোমার বই-এর ই-বুক সংস্করণ নামিয়ে নিতে পারো।

বাংলা ভাষাতেও এখন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স চালু হয়েছে। এরকম একটি সাইট হল <http://www.shikkhok.com/> এখানে গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, কম্পিউটার কৌশল ইত্যাদির বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ আছে।

অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের মতো ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানার সহজ উপায় হলো কোন একট সার্চ ইঞ্জিনে এ সম্পর্কিত তথ্য তালাশ করা। তথ্য খোঁজার জন্য সঠিকভাবে অনুসন্ধানটি লিখতে হয়।

The screenshot shows a Google search for "newton's second law". The search bar contains the text "newton's second law" and a search button. Below the search bar, it says "Search About 2,020,000 results (0.21 seconds)". The search results are categorized into Web, Images, Maps, Videos, News, Shopping, and More. The top result is "Newton's laws of motion - Wikipedia, the free encyclopedia" with a link to "en.wikipedia.org/wiki/Newton's_laws_of_motion". Below this, there are several images illustrating Newton's second law, including a diagram of a car being pushed, a diagram of a car with a force vector, and a diagram of a car with a force vector and a mass vector. The text below the images reads: "Newton's Second Law of Motion teachertech.rice.edu/Participants/fouviere/Newton/law2.html Mike's car, which weighs 1,000 kg, is out of gas. Mike is trying to push the car to a gas station, and he makes the car go 0.05 m/s/s. Using Newton's Second Law, ...".

এখানে সার্চ ইঞ্জিন গুগলে নিউটনের গতি সূত্র সংক্রান্ত তথ্য খোঁজার একটি উদাহরণ দেখানো হল। দেখা যাচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষাধিক গুয়েবসাইট বা ডিডিওতে এ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। সেখান থেকে তুমি তথ্য বেছে নিতে পারো।

সব সার্চ ইঞ্জিনেই সঠিকভাবে লিখতে পারলে যে কোনো তথ্য সম্পর্কে অসংখ্য তথ্যের লিংক পাওয়া যায়। এজন্য ইন্টারনেট থেকে তথ্য বের করার কাজে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারে দক্ষ হতে হয়। এই দক্ষতা অর্জন সহজ হয় যদি তুমি নিয়মিত তা ব্যবহার কর।

ইন্টারনেটে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের লিঙ্ক সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করা যায়। সার্চ ইঞ্জিনে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে তথ্য অনুসন্ধান করা যায়।

ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য। সেখানে থেকে বাছাই করা কয়েকটি সাইটের বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।

১। <http://www.ebook.gov.bd/> এটি বাংলাদেশের ই-বুকের সমাহার। এখানে রয়েছে

দলগত কাজ

এবার গুগল বা ইয়াহু বা তোমার প্রিয় কোন সার্চ ইঞ্জিনে নিচের শব্দাবলী দিয়ে সার্চ করে সেটির ফলাফলগুলো দেখ:

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা
২. Origin of Matter
৩. William Shakespeare
৪. কাজী নজরুল ইসলাম
৫. পদার্থের তিন অবস্থা

তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক সংস্করণ। ই-বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ। এই বইগুলো কম্পিউটারের পর্দায় পড়া যায়, পাতা উল্টানো যায়, যে কোনো পাতায় চলে যাওয়া যায়। এই সাইটে গিয়ে তুমি তোমার ক্লাসের যে কোনো বই খুঁজে বের করতে পারবে। শুধু তোমার ক্লাশের নয়,

তোমার ছোট ভাইবোনের বা তোমার আপু-ভাইয়াদের বইও তুমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে তোমার কম্পিউটারে।

২। <http://www.moedu.gov.bd> এটি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শিক্ষানীতি, সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা শুরু বা এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ ইত্যাদি এই সাইট থেকে জানা যায়।

৩। উইকিপিডিয়া (<http://en.wikipedia.org>, <http://bn.wikipedia.org>) ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় মুক্ত বিশ্বকোষ হল উইকিপিডিয়া। এটি সারা বিশ্বের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তৈরি করেছেন এবং ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রায় দুইশ'রও বেশি ভাষায় এটি চালু রয়েছে তবে আমাদের জন্য এর ইংরেজি ও বাংলা বিশ্বকোষটি খুবই দরকারি। ইংরেজি ভাষার উইকিপিডিয়াতে ৪০ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধ রয়েছে যার অনেকগুলো সরাসরি শিক্ষা সংক্রান্ত। প্রত্যেক উইকিপিডিয়াতে অনুসন্ধান করার একটি বাক্স রয়েছে। সেখানে তোমার কাঙ্ক্ষিত শব্দ বা শব্দাবলী লিখলে তুমি এই সংক্রান্ত নিবন্ধ বা নিবন্ধাবলী দেখতে পাবে। বাংলা ভাষায় উইকিপিডিয়া এখনো ততটা সমৃদ্ধ নয়। এতে প্রায় ২৩ হাজারের বেশি নিবন্ধ আছে এবং সেখান থেকে তোমার কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতেও পারো।

৪। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষা সাইট হলো <http://www.khanacademy.org/>। খান



বাংলা ভাষায় খান একাডেমির ভিডিও থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করে ডাউনলোড করা যায় একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শিক্ষাবিদ সালমান খান ২০০৬ সালে সাইটটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাইটে তিনি প্রায় ৩ হাজার ৪০০টি ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গণিত, ইতিহাস, স্বাস্থ্যসেবা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, মহাকাশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি। এই ছোট ভিডিওগুলোতে সালমান খান তার নিজের মতো করে বিষয়গুলোকে সহজভাবে ফুলে ধরেছেন। তার ভিডিওগুলো এরই মধ্যে ১৮ কোটিরও বেশিবার ডাউনলোড হয়েছে। এখান থেকে তুমি তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে নিতে পারো।

৫। বাংলা ভাষায় খান একাডেমির ভিডিও: (<http://www.khanacademy.org/intl/bn>) সালমান খানের সব ভিডিও ইংরেজি ভাষাতে। তবে, আনন্দের বিষয় হলো এই ভিডিওগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনূদিত হয়েছে যার মধ্যে বাংলা ভাষাও রয়েছে। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদ তুমি এই ঠিকানার পাবে - এখানকার ভিডিওগুলো জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং জৈবরসায়ন এই চারভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক লিংকের শুরুতে তালিকা রয়েছে যা থেকে পছন্দমতো ভিডিও বাছাই করা যায়। আর গণিতের ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে এই ঠিকানার <http://www.youtube.com/user/KhanAcademyBangla> এখানে ১২৫৮টি ভিডিও রয়েছে। তুমি তোমার পছন্দ মতো বীজগণিত, পাটিগণিত, পরিসংখ্যান, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদির ভিডিও থেকে তোমার দরকারি ভিডিওটি ডাউনলোড করে শেখার কাজে লাগাতে পার।

৬। <http://www.bbcjanala.com/> এটি একটি ইংরেজি ভাষা শেখার সাইট। ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষা শেখার অজস্র সাইট রয়েছে। তবে, এই সাইটটি আমাদের দেশের উপযোগী উদাহরণ এবং ব্যাখ্যার কারণে দেশে বেশি জনপ্রিয়। এই সাইটে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেশকিছু চমৎকার কোর্স রয়েছে। ইন্টারনেটে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে যে কেউ খুব সহজেই এই কোর্সগুলোতে অংশ নিতে পারে। কোর্স শেষে কোর্স রিপোর্ট বা কোর্স সমাপনী শিট করে নেওয়া যায়। তোমার ইংরেজির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তুমি এই কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পার।

৭। <http://mathforum.org/dr.math/> **Dr Math** একটি জনপ্রিয় গণিত বিষয়ক সাইট। এই সাইটে স্কুল পর্যায়ের গণিতের বিভিন্ন বিষয় সহজ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথেষ্ট উদাহরণ এবং বিভিন্নভাবে বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্যালকুলাসের নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এই সাইটে কোনো বিষয় পাওয়া না গেলে তা জানার জন্য Dr Math কে প্রশ্ন করা যায়।

৮। <http://www.matholympiad.org.bd/forum> এটি একটি গণিত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, আলোচনার সাইট। বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এটি পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে এই ফোরামটিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এখানে বিভিন্ন সময় প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

৯। <http://www.learningscience.org/> হাতে কলমে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

১০। ঐতিহাসিক মৌলিক গ্রন্থ সমূহ: আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের বিশাল অবদান। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারকগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাদের সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের লিখিত বইয়ে। ইন্টারনেটে এরূপ মৌলিক গ্রন্থগুলোর ডিজিটাল সংস্করণ পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটি গ্রন্থের লিংক নিচে দেওয়া হল:

ইউক্লিডের এলিমেন্টস	http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookI/bookI.html
নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা	http://www.scribd.com/doc/19058378/English-Translation-Version-Philosophi-Naturalis-Principia-Mathematica
ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পেসিস	http://www.talkorigins.org/faqs/origin.html

এইরূপ প্রায় সকল বিখ্যাত গ্রন্থের ডিজিটাল সংস্করণ এখন ইন্টারনেট থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়। সঠিকভাবে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তুমি সেটা বের করে নিতে পার।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে বাংলাদেশের স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক ডাউনলোড করা যায়?
 - ক. ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
 - খ. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
 - গ. কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
 - ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
২. ওয়েব সাইটে স্কুল ও মাদ্রাসার যে পাঠ্যপুস্তকগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে কী বলে?
 - ক. ই-বুক
 - খ. ইন্টারনেট বুক
 - গ. এনসিটিবি বুক
 - ঘ. ডিজিটাল বুক
৩. ইন্টারনেটের সাহায্যে -
 - i. পাঠবিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়
 - ii. ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়
 - iii. অনলাইনে ক্লাস করা যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i ও ii
 - খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গণিত ও ইংরেজিতে অনি প্রায়ই খারাপ ফলাফল করে। খেতে হয় মা-বাবার বকুনি। প্রথাগতভাবে গণিত শিখতে তার ভালো লাগে না। আনন্দের সাথে সে গণিত শিখতে চায়। অনির ইচ্ছা সে অন্যদের মত গণিত শিখে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবে।

৪. অনি তার সমস্যা সমাধানে সাহায্য পেতে পারে -
 - i. ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে
 - ii. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে
 - iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - ক. i ও ii
 - খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii
 - ঘ. i, ii ও iii

৫. অনির জন্য গণিত শেখার সবচেয়ে সুবিধাজনক ওয়েবসাইট কোনটি?
- ক. www.matholympiad.org.bd
খ. www.khanacademy.org
গ. www.mathforum.org/dr.math/
ঘ. www.khanacademy.org/intl/bn/

সমাণ্ত



রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য